SPANDAN

স্পন্দন

পিপিবিপি ই-জিন

প্রথম সংস্করণ [অক্টোবর ২০১৮]

পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদ

© Manjusha Ganguly

সূচীপত্র

FOREWORD 3

সম্পাদকীয় 4

।। অয়ি গিরিনন্দিনী ।। 7

পুজো পরিক্রমা 13

সিলেটের দুর্গাপুজো এবং এক ভোজন রসিকের আক্ষেপ 17

অসামাজিক হওয়ার গাইড 20

How I Want A SMART CITY! 23

I Am Death 24

গল্পটি। 26

বিদেশে রাস্তায়। 28

কল্পনা 29

মধ্যবয়েসের মনস্তত্ত্ব 31

একাঙ্গী 33

কিস্যা ভুতো কা। 37

অতুলদাদা 40

FOREWORD

Dear Friends,

At the outset, I, on behalf of myself and the entire Management Committee of Pashchim Pune Bangiya Parishad wish you a very happy festival time!

As we all know, Pashchim Pune Bangiya Parishad, or PPBP, stands on the foundation of a set of solid core values of Equality & Self Reliance, promoting Bengali Culture in and around Western Pune. Having completed a very successful run of 15 years, we are now on the path of becoming a self-sustaining organization, and have initiated providing social services to the underprivileged sections of the society in and around Pune.

We believe staying in touch with all the members on a continuous basis which will go a long way establishing a close-knit and like-minded community. This, in turn, would help in fulfilling our objectives much more effectively. This e-zine is our latest initiative in that direction.

We request you to please use this e-zine to express – your creative work, as well as for sharing your views.

Happy reading and writing,

Dr. Bidya Bijay Bhoumik

President, Pashchim Pune Bangiya Parishad

সম্পাদকীয়

মহালয়া। পিতৃপক্ষের শেষ, দেবীপক্ষের শুরু। বিধিসম্মত পঞ্জিকাতে যাই থাকুক, আধুনিক বাঙ্গালীর পুজো শুরু মহালয়ার ভোরে বীরেন ভদ্রের জলদগম্ভীর স্বরে আকুল মা- মা ডাকে। আমাদের এই ঘোর প্রবাসে অবশ্য পাশের বাড়ির রেডিও গর্জনে ভদ্র মশাইয়ের চণ্ডীপাঠে ঘুম ভাঙ্গার কোন সুবিধে নেই। ঘড়িতে দম দিয়ে উঠে, mp3 সহায় করে আমরা সোফায় আর এক টুকরো ছোট্ট ঘুমের বন্দোবস্ত করি ইশকুল- কলেজ- আফিস- কাছারিতে হাজিরা দেবার আগে। শরতের নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘের আনাগোনা, মাঠে- ঘাটে, নদীর চরে কাশফুলের উঁকিঝুঁকি - ইশকুল পাঠ্য রচনায় পুজোর আবহের এই চিরাচরিত বর্ণনা নতুন প্রজন্ম তো চেনেই না, আমাদের কাছেও ক্রমশ অচেনা। বৃষ্টির কালো মেঘ যাই যাই করেও মাঝে মাঝেই আরব সাগরের উপকূলে এসে হানা দিয়ে যাচ্ছে। শিবাজী মহারাজের আপন দেশে কাশফুলও অপ্রতুল। পুজোর দিনগুলোয় বাংলার মাটিতে ফেরার আয়োজনও অনেক পরিবারেই আর নেই।

তবে পুজো আছে। শহরের রাজপথ- অলিগলি থেকে গণপতি- বাপ্পা বিদায় নিতে না নিতেই মা' র হাত ধরে তিনি আবার মামাবাড়ি- মুখো। ঢাকে কাঠি পড়েই গেছে । ঘরে ঘরে ছোটরা ষাণ্মাসিক পরীক্ষা দিতে দিতে সপ্তাহ খানেকের পুজোর ছুটির (যার পোশাকী নাম autumn break) অপেক্ষায়। তারই মধ্যে পড়াশোনা কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে চলছে ছেলেবুড়োর গান- নাচ- নাটকের মহড়া। ইতিমধ্যে অবশ্য ঘরে- বাইরে ব্যাস্ত মানুষের সংসারেও পুজোর নতুন জামা- জুতো এসে পৌঁছে গেছে amazon, flipkart ইত্যাদির সৌজন্যে।

অনেকেরই দশমী বাদে পুজোর দিনগুলিতেও হাজিরা খাতা চালু। তা থাক। তার সঙ্গে ভর দুপুরে টুক করে মণ্ডপে পৌঁছে ভোগের লাইন ঢুকে পড়া, আর সন্ধ্যেবেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখার অজুহাতে খাবার স্টলগুলিতে ঘুরে বেড়ানোও চলতে থাকবে ।

বাঙ্গালীর পুজো মানেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাঙ্গালীর পুজো মানেই শারদীয়া পত্রিকা। ২০১৮ র মহালয়ার পুণ্য লগ্নে পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদের পত্রিকা, আমাদের নিজস্ব পত্রিকা, স্পন্দন, এর শুভ উদ্বোধন। প্রযুক্তি- সমৃদ্ধ জীবনচর্যার সঙ্গে মানানসই e- পত্রিকা। এর জন্য লেখা- আঁকা এসেছে email এ, সম্পাদকীয় বৈঠক হয়েছে whatsapp আর telecon এ, অলঙ্করণ আধুনিক image processing software এ, আর সবশেষে পত্রিকা আপনার smartphone বা computer এ পৌঁছে গেল আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে আলোর গতিতে। তবে e-পত্রিকা হলে কি হবে, ছাপাখানার ভূতের হাত থেকে রেহাই পাবার যো নেই। কবির ' কল্পনা' ভিন্ন software আর বিজাতীয় operating system এর প্রসাদগুণে ' কপ্পনা' হয়ে যাচ্ছে, অলংকরণ বিভাগের অল্প- না চেষ্টা সত্বেও। সংস্কৃত শ্লোক এর ' লুপ্ত অ' কে অগত্যা রফা করতে হচ্ছে ' হ' এর সঙ্গে। কাজেই ভুল- ত্রুটি অনিচ্ছাকৃত হলেও কিছু রয়েই গেল।

অজস্র মানুষের শুভেচ্ছা আর সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই পত্রিকা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে

উঠতে পারত না, বলাই বাহুল্য। প্রথমেই আসবে পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদ পরিচালন সমিতির কথা - যাঁদের উৎসাহ এবং অনুমতিক্রমে স্পন্দন এর পথ চলা শুরু। আর নাম করতেই হবে শ্রী আশিস কুমার ধর এর, যিনি পরিচালন সমিতি আর স্পন্দনের সম্পাদক- মণ্ডলীর মধ্যে যোগসূত্রের কঠিন কাজটি অনায়াসে সামলেছেন। পেয়েছি বয়োজ্যেষ্ঠদের সুচিন্তিত রচনা, ছোটদের উৎসাহী আঁকা- লেখা, প্রথিতযশা লেখক- শিল্পীর সৃষ্টি - যা না হলে পত্রিকা তৈরীই করা যেত না। আর সম্পাদনা, গ্রন্থনা এবং অলঙ্করণ এর কঠিন কাজ যাঁরা করেছেন - ঘরে- বাইরে নানান ব্যস্ততার মাঝে, কেউ বা অতি গুরুত্বপূর্ণ পেশার দায়িত্বগুলি মিটিয়ে - তাঁদের অবদান বাস্তবিকই অসামান্য। সব মিলিয়ে, আমাদের সকলের মিলিত উদ্যোগে এই প্রকাশ, আমাদের সকলের জন্য।

দেবীপক্ষের শুরু। উৎসবের শুরু। আলোয় আলোকময় হয়ে উঠুক আগামী দিনগুলি।

সুশান কোনার

(সম্পাদক- মণ্ডলীর পক্ষে)

সম্পাদনা: সুশান কোনার, অভিমন্যু সেনগুপ্ত, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, সৌমিত্র মণ্ডল
গ্রন্থনা: মেঘনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইমরান কাজী, আশীষ কুমার ধর
অলঙ্করণ: মেঘনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র মণ্ডল ও বিবিধ (internet থেকে সংগৃহীত)
প্রচ্ছদ চিত্র: মঞ্জুষা গঙ্গোপাধ্যায়

।। অয়ি গিরিনন্দিনী ।।

- শিবানী সেনগুপ্ত

যা চন্ডীমধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মূলিনী

যা ধূম্রেক্ষনচন্ডমুন্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।

শক্তি: শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রীপরা

সা দেবী নবকোটীমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী ।।

যে চন্ডিকা মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী, মহিষাসুরমর্দিনী, ধুম্রলোচন - চন্ডমুন্ডাসুর - সংহারিনী, রক্তবীজ- ভক্ষয়ত্রী, শুম্ভনিশুম্ভাসুর - বিনাশিনী ও শ্রেষ্ঠা সিদ্ধিদাত্রী এবং নবকোটি - সহচরী - পরিবৃতা, সেই জগদীশ্বরী দেবী আমাকে পালন করুন।

' শরৎশিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে' - কবির এই গানটিই শরতের ধ্বনি। এই গানের অনুরণনে... তার মূর্ছনায় এক আত্মস্থ ভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে। শরতের সোনালি ধানের ক্ষেত আর শিউলি- বিছানো অংগনে এক মহাশক্তির আগমনের উন্মাদনায় যে আত্মস্হভাব অনুভব করি, সেটাই আমাদের মহাপূজার প্রাণ।

এই মহাশক্তির আরাধনা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতে প্রচলিত। পাঁচ হাজার

বছরের আগেও পঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদারোতে দেবীপূজা প্রচলিত ছিল বলে অনুমিত। এই দুই নগরীর ধ্বংসাবশেষ - সিন্ধু নদের তীরে, অসংখ্য মৃণ্ময়ী দেবীমূর্তি প্রমান করে যে, এই দেবীই ছিলেন এখানকার অধিবাসীদের আরাধ্য প্রধান দেবতা। বৈদিক যুগেও শক্তিবাদ যে শুধু প্রচলিতই ছিল না, তা যে ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল - এটা প্রমাণ করে ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসুক্ত। এমনকি ঋগ্বেদে - বিশ্বদুর্গা, অগ্নিদুর্গা, সিন্ধুদুর্গা ও অন্যান্য দেবীর উল্লেখ আছে। গায়ত্রী বেদমাতা ও শ্রেষ্ঠ বেদমন্ত্র। এটি প্রভাতে ঋগ্বেদধারিনী কুমারী, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদধারিনী যুবতী এবং সায়াহ্নে সামবেদধারিনী বৃদ্ধা।

আবার বেদোত্তর যুগের সাহিত্য থেকে জানা যায়, ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভেদ। নানা উপনিষদে ব্রহ্মের ঈক্ষণ, যা ব্রহ্মের নিত্য- জ্ঞান- ইচ্ছা- ক্রিয়া, বহুভাবে বর্ণিত। এই জ্ঞান- ইচ্ছা- ক্রিয়াই - যেটাকে সৃজনশীল ভাবা যায়, সেটাই ব্রহ্মধর্ম। পরবর্তী কালেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতিতে দেখি - ' ব্রহ্মই কালী এবং কালীই ব্রহ্ম' ।এর কোন দ্বিমত নেই। দেবাসুর সংগ্রামে এই ব্রহ্মশক্তিদ্বারাই দেবতাদের বিজয় ও তাঁদের গৌরবের কাহিনী আমরা সকলেই জানি। এই মহাশক্তিই বৈদিক যুগ থেকে ভারতে বন্দিতা হয়ে আসছেন। এই আদ্যাশক্তির ধ্যান করে অনাদি অনন্তকাল থেকে আমরা জীবনে সংহত হবার চেষ্টা করি। শ্রীশ্রীচন্ডিকার ধ্যান স্মরন করি এই পর্যায়ে - : আগমশাস্ত্রে বর্ণিতা এই মহাদেবীকে নিত্য উত্তমরূপে স্মরণ করি। - :

ওঁ বন্ধূক- কুসুমাভাসাং পঞ্চমুন্ডাধিবাসিনীম্

স্ফুরচ্চন্দ্রকলা- রত্ন- মুকুটাং মুন্ডমালিনীম্ ।

ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীং

পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাৎ ।।

দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাস্নায় মানিতাম ।

দেবী- বন্ধুকপুষ্পবর্ণা ও শিরোপরিসংস্থিতা, উদীয়মানচন্দ্র, মুকুটরত্নরূপে শোভিতা, মুন্ড- মালা শোভিতা, উন্নতঘটসমকুচযুক্তা, ত্রিনয়না ও রক্তবসনা, পুস্তক, রুদ্রাক্ষমালা এবং বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারিনী - তাঁকে ধ্যান করি।

শ্রীশ্রীচন্ডীতে বর্ণিত মহিষাসুর জীবের আত্মকেন্দ্রিকভাবের প্রতীক। নিখিল বিশ্বের সংগে একত্বের অনুভূতি ছাড়া এই আত্মকেন্দ্রিকতার বিনাশ হয়না। দেবী মহামায়া তার ধ্বংসের জন্য প্রলয়কালে সমুহ দৈবীতেজ দেবকূলের - আর তাঁদেরই দেওয়া বিভিন্ন আয়ুধ- অস্ত্রে সুসজ্জিতা হয়ে, তাঁদের আকূল স্তুতিতে সাড়া দিয়ে, তিনি অট্টহাসিতে ভরিয়ে তুলেছেন ভুবনখানি।

ভয়ঙ্কর শব্দে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে আকাশ বাতাস। দেবতাদের প্রার্থনা দৈত্যকূলবধঅন্তে - :

সর্ববাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যা অখিলেশ্বরী।

এবমেব ত্বয়া কার্য মস্মদ্বৈরীবিনাশনম্ ।।

হে ত্রিভুনেশ্বরী, তুমি যেমন অসুরদলন করে ত্রিলোকের বিঘ্ননাশ করলে, এমনভাবেই সদা সর্বদা জগতের কল্যাণ সাধন কোর। দেবীও আশ্বাস দিয়ে বলছেন - যখনই তোমাদের দানবকৃত বিপদ আসবে, আমিও তখন অবতীর্ণ হ' য়ে তোমাদের শত্রুনাশ করবো।

আমরা সকলেই এই শক্তির পরিমন্ডলে বাস করছি। জগজ্জননী মা- সৃষ্টিতে আনন্দরূপা, স্থিতিতে পরমকরুণাময়ী রূপে তাঁর প্রকাশ। আবার প্রলয়কালে তিনি নিজ সৃষ্টি নিজ হাতে ধ্বংস করেন। চন্ডীতে তাই বলা হয়েছে - তাঁর চিত্তে কৃপা ও সমরনিষ্ঠুরতা একই সংগে খেলা করছে।

এর পরবর্তী পর্যায়ে এসে আমরা দেখি, দশপ্রহরণধারিনী শক্তিময়ী মা, আমাদের ঘরের মায়ের সংগে একসূত্রে বাঁধা হয়ে রয়েছেন। সংসারে, প্রয়োজনবোধে রাগান্বিত আমাদের মা- ও রাগ প্রশমিত হলে, সন্তান- বাৎসল্যে স্নেহ বিলিয়ে আমাদেরই বিপদমুক্ত করেন।

এই মানবতার সুরে, বর্ষকাল সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মর্তের মায়েরা, কন্যায় রূপান্তরিত জগজ্জননী মাকে, ব্যাকুল আহ্বান জানান কৈলাস শিখর থেকে। বাংলায় গ্রামে এই সময় মন- মুক্ত করা কত বাউল- ভক্তদের আগমনী গানে এই আর্তি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। মা - মেনকার এই আকুলতা দেখি এই আগমনী গানে - :

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী,

উমা নাকি বড় দু:খে রয়েছে।

দেখেছি স্বপন- নারদ- বচন

উমা ' মা' ' মা' বলে কেঁদেছে।।

অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে মায়ের এই ব্যাকুলতা সত্যিই আমাদের সকলের মন ছুঁয়ে যায়। মাত্র চারটিদিনের জন্য গৌরী স্বামী- সন্তান আর বাহনসহ আসছেন। মায়ের মনে সীমাহীন আনন্দ এই স্নেহের পুতলিকে কিভাবে যে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নেবেন, তারই কল্পনা এই মুহূর্তে। বরণ- উৎসবের আয়োজন চলছে। মা জননী তাঁর আপনমনের মাধুরী দিয়ে বিবিধ বস্ত্রসম্ভার, অলংকার, চন্দন, সিঁদুর ও অপর্যাপ্ত ফুলে মালায় সাজিয়ে দিয়েছেন। তার পরম স্নেহের ধনকে তাঁরই পছন্দমত খাদ্যবস্তু সাজানো সামনে। তারপর, সবই তাঁর পায়ে

অর্পন করে, তাঁকে নানা উপাদানে আরতি ক' রে - নৃত্যের মধ্য দিয়ে, আনন্দ-সাগরে সবাই মেতে উঠেছে। অবাক বিস্ময়ে, এই তাঁর বুকের ধন - স্বর্গীয়া দুলালীর দিকে, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন মা। বিয়োগের ভাবনা, এখন তাঁর অভাবনা- তবু মনে পড়লো আরেকটি আগমনী গান - :

বলে বলুক লোকে মন্দ

এবার উমা এলে,

আর উমায় পাঠাবো না ।।

মুহূর্তে যেন করুন সুরের মাঝে বিজয়াদশমীর সকাল আগত। বিদায়-ব্যথায় তার বরণসমারম্ভ চোখের জলে। তাঁকে আলতা-সিঁদুর পরিয়ে মুখে পান মিষ্টি দিয়ে যাত্রা প্রস্তুত। মুহূর্ত-পূর্বের আনন্দিনী - মায়ের স্নেহের নন্দিনীকে আদরে বিদায় দেবার যে বেদনা, তা সংসারে প্রতিটি মা নিজের অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেন।

আজ একুশশতকের মহাপূজা। চারিদিকে নয়নমেলে তাকিয়ে দেখি - জগৎজোড়া অশান্ত অবস্থা। শুভাশুভের মন্থনে, বিচিত্র সমাজ একরাশ সংশয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কোনও এক আসুরী শক্তি আজ মানুষকে বিপথে পরিচালিত ক' রে বিপর্যস্ত করে তুলছে। আগ্রাসী আকাঙখার কবলে মানুষ আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট, অস্থির, উদভ্রান্ত এবং বাস্তবিকই বিভ্রান্ত। সমাজে যেন স্থিতিশীলতা হারিয়ে গেছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেদের মনকে সংহত করার একান্ত প্রয়োজন। উপনিষদে বর্ণিত ' শান্তোহয়ম আত্মা' - এই মন্ত্রে মানুষ তার মনোজগতের সমস্ত জটিলতার ধীরে ধীরে সমাধান লাভ করে। এটাই গভীরতম মানবতাবাদ। এর মধ্যে আছে প্রশস্ত সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা - যা স্থায়ী ও দৃঢ় এবং পরিবেশের সঙ্কীর্ণ চাপের নাগালের বাইরে। এই সব কারণে আমাদের দুর্গাপূজার সার্থকতা কেবল পূজারূপে নয়, এই পূজাকে কেন্দ্র করে সমাজে সকলের সমাবেশে যে উৎসব হয়, তার কেন্দ্রবিন্দুরূপে।

আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে মাগো, তোমাকে আবাহন করি। তুমি দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে - যে আসুরী শক্তি মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলছে তার বিনাশ করো আর ' শতাক্ষী' রূপে এসে মানবিকতার এই গ্লানি দূর করো। আমাদের প্রার্থনা, অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে, তোমার কাছে - তোমার দেওয়া রূপ, জয়, যশ, ইত্যাদির সংগেও - আমাদের যে মূল ধর্ম = সততা, অপরের প্রতি ভালবাসা, দয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ত্যাগ, সেবা, আজ্ঞাবহতা, পবিত্রতা, কর্তব্যবুদ্ধি, সহিষ্ণুতা, ইত্যাদি সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে, যেন তোমারই আদর্শে ও নির্দেশে সেবাব্রতে ব্রতী হতে পারি। আর তোমারই মত মানসিক

দৃঢ়তা লাভ করে, আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সমাজের যোগ্য সন্তান হতে পারি।

মহালয়ার পুণ্য প্রভাত সমাগত। পশ্চিমপুণা বঙ্গীয় পরিষদে আমাদের ভাইবোনেরা - তাদের অপর্যাপ্ত আনন্দ- উৎসাহে সৃজনশীল হয়ে সাজিয়েছে তাদের পূজার ডালি - শারদীয়া পত্রিকার মাধ্যমে এটা পরিবেশিত হচ্ছে। এই e-journal এর প্রথম সংখ্যার যাত্রা আজ শুরু। সকলের পারস্পরিক ভাবনাচিন্তার বিনিময়ে এর মূল্য অপরিসীম। বাস্তবিক, সদস্যদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে এটা একটা বিরাট সেতু। এছাড়া, এই প্রকল্পের মাধ্যমে, বর্তমান প্রজন্মকে, যার যেটুকু সাধ্য, সেইটুকু অবদান করাতে উৎসাহিত করাতে পারলে, আমার মনে হয়, এর সার্থকতার মান আরও উন্নত হবে। একে অন্যের সংগে সম্পর্কস্থাপনের উদ্দেশ্যে এই স্বত:স্ফূর্ত আনন্দমেলা বাস্তবিকই উপভোগ্য। দৃপ্ত পদক্ষেপে এর অগ্রগতির জন্য, মাগো, তোমার শুভাশীর্বাদ প্রার্থনা করি - :

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ

প্রসীদ মাতোর্জগতোহখিলস্য ।

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বম্।

ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ।।

হে অখিল জগতের জননী, সমগ্র চরাচরের দেবী বিশ্বেশ্বরী, এই বিশ্বকে তুমি রক্ষা করো ও আমাদের প্রতি প্রসন্না হও।।

Sivani Sengupta 'Sivani di' or 'Maago' did her post-graduate in Sanskrit Calcutta University and Ph.D. in Library & Information Science from Pune University from where she retired as a faculty member in 1997. She has also been teaching Bangla at Surajhankar, Pune. Widely travelled, she has a keen interest in literature, theatre (especially active with children's theatre), music, art, cooking and needlework.

Tista Bandyopadhyay
Class IV, Vidya Valley School

পুজো পরিক্রমা

- জোনাকি ভট্টাচার্য

আমরা বাঙ্গালীরা, প্রচণ্ড হই-হুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, থিয়েটার-নাটক, ঘোরা-বেড়ানো - এই সবই ভালোবাসি। এসবই আমাদের মজ্জাগত। এক কাপ চা নিয়ে বেশ ক ঘণ্টা আড্ডায় মশগুল থাকা বোধ হয় আমাদের মতো কেউ পারেনা। আর এসবে ছোট বড়, ছেলে মেয়ে, বাচ্চা বুড়ো, সবাই ভীষণ আনন্দ পায়, খুব উপভোগ করে। পুজো আসার বেশ কমাস আগে থেকেই, ঘরে ঘরে এক অদ্ভুত উত্তেজনা দেখা দেয়। সব জায়গায়, সবার সঙ্গে, শুধু একই কথা - পুজোর সময় কে কি পরবে, কোথা থেকে কেনাকাটা করা হবে, কোনটা নতুন ফ্যাশন, কে কোন প্যান্ডেলে যাবে, কোথায় ভালো খাবার স্টল হয়, কোথায় ভোগ খাওয়া হবে ইত্যাদি।

আমি পুরোপুরি প্রবাসী, একেবারে ১০০ ভাগ। জন্ম, বড় হওয়া, লেখা-পড়া, নাচ-গান, থিয়েটার, বিয়ে - সবই দিল্লীতে। তারপর নানান জায়গা ঘুরে, গত ৪৫ বছর ধরে পুণায়। জন্ম থেকে দিল্লীর পুজোর সঙ্গে জড়িত, মা-বাবার সঙ্গে। সকাল-সন্ধ্যে পুজোর সময় উপস্থিত থাকাটাই তখন আসল উদ্দেশ্য ছিল। রাত্রে বাবা মা stage performance করতেন। মা খুব ভাল গান গাইতেন, আর বাবা হারমোনিয়াম, এস্রাজ, তবলা বাজিয়ে সঙ্গত করতেন। সে এক অপূর্ব স্মৃতি। তখন এতো জামাকাপড়ের বাহার ছিল না, আর আমরা বাচ্চারা কি চাই, কি চাইনা অত বুঝতাম না। বেশ কটা নতুন ফ্রক হতো, আর বাটার জুতো। জামাকাপড় সবই মা পছন্দ করতেন, ওনার কথামতো সেলাই হতো, আর আমরা ভীষণ খুশী হয়ে পরে গর্বিত ভাবে প্যান্ডেলে ঘুরে বেড়াতাম। থিয়েটার, নাটক, সিনেমা সবই দেখতাম, প্যান্ডেলে খাওয়াদাওয়া করতাম। তাতে কোনদিন কোনও শ্রীর খারাপ হয়নি, অথবা লেখাপড়ার ক্ষতি হয় নি। অবশ্য তখন পুজোর সময় পরীক্ষাও থাকত না, আর এতো প্রতিযোগিতাও ছিল না। দিল্লীতে তখনও বেশ কটা পুজো হত। তাই pandal hopping এর হাতেখড়ি খুব অল্প বয়সেই হয়েছে। কোন দিন কোথায় যাওয়া হবে, বাবা আগেই বলে দিতেন, আর পাড়া প্রতিবেশীর বাচ্চারাও আমাদের সঙ্গেই যেত।

বিয়ের পর নিজের জীবনেও পুজোর সময় চুটিয়ে আনন্দ করেছি, ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে, স্টল এ রান্না করা, হৈ হৈ করে খাবার বিক্রী করা, থিয়েটার, নানান প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া - সব করেছি। বহু পুরষ্কার ও পেয়েছি। ছেলেরাও এসবের মধ্যে দিব্যি ভাল ভাবে বড় হয়েছে। ওরাও আবৃত্তি, fancy dress, বাচ্চাদের থিয়েটার - সবই করেছে। সবাই প্রায় দিন রাত প্যান্ডেলেই থাকতাম। তখন সারা রাত বাংলা সিনেমা হত, সবাই বসে দেখতাম। সঙ্গে প্যান্ডেলের নানান খাবার, বিশেষ করে ভীষণ মিষ্টি চা। আমাদের প্রবাসীদের সম্বন্ধে অনেকের নানান রকম ভুল ধারণা থাকে। আমরা বাংলা জানিনা, বাংলা রান্না করতে পারি না, (আমার বাড়ি এসে দেখুন!), বাংলা সাহিত্য, গান, বাজনা, থিয়েটার, নাটক বুঝি না। কিন্তু একটু মিশে দেখলেই এইসব ধারণা পালটে যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা বাংলার বাইরে, তাই এসবের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ, খুব উপভোগ করি, আর কোনও সুযোগ ছাড়ি না।

এখনকার পুজো, একেবারেই অন্য রকম, অনেক কিছুই পালটে গেছে, কিন্তু যেটা পালটায় নি সেটা হল হৈ হৈ, তোড়জোড় করে পুজোর জন্য তৈরি হওয়া। শাড়ী, ব্লাউস, ঘাগরা, জিনস, ছেলেদেরও পোশাকের বাহার - সবই অত্যাধুনিক, সিনেমার তারকাদের থেকে নেওয়া ফ্যাশন। আর অনেক মাস আগে থাকতেই ছুটোছুটি আরম্ভ হয়, কিন্তু তবুও

পুজোর দিন এগিয়ে আসলে, চারিদিকে শোনা যায় - লাল ব্লাউসটা তৈরি হয়নি, জুতো কিনতে হবে, ম্যাচ করছে না, দরজিরা কাজ নিতে চাইছে না, কি ভীষণ চিন্তা। বাজার-হাট, সিনেমা-মল - কোথাও গেলেই বাংলা কথা শুনতে পাই, সব জায়গায় বাঙ্গালী ভীষণ ব্যাস্ত হয়ে নিজেদের সব প্রস্তুতি করছে। এতো বাঙ্গালী পুণায় আছে? সারা বছর এরা কোথায় থাকে? আরে বাবা, সারা বছর আর দুর্গা পুজোর মধ্যে তফাত আছে না? আগে পুণায় বাংলা খাবার-দাবার, ভাল মিষ্টি পাওয়া যেত না, কিন্তু এখন বহু জায়গায় নানান বাঙ্গালি খাবার পাওয়া যায়, প্রচুর মিষ্টি, আর সব জায়গায় পুজোর জন্য special buffet. কিন্তু যতোই হোক না কেন, পুজো প্যান্ডেলের মজা অন্য কোথাও পাওয়া জায় না। তাই ওই কটা দিন সবাই সকাল থেকে প্যান্ডেলে যাবার জন্য ব্যাস্ত হয়ে পড়ে। কোনও রকমে সংসার সামলে, সোজা প্যান্ডেল। আর ওই মিষ্টি চা, আর ছোট ছোট সিঙ্গাড়া নিয়ে আড্ডা। "কি বৌদি, কেমন আছেন" শুনলেই ভেতরটা আনন্দে ভরে যায়।

ভগবানের দয়ায়, আমি পৃথিবীর বহু জায়গায় দুর্গা পুজোর আনন্দ উপভোগ করেছি। বিদেশে প্রথাটা অন্য রকম হলেও ভাল লেগেছে। ওখানে সবার সুবিধে দেখে, সপ্তাহান্তে এ পুজো করা হয়। শুক্রবার বিকেল থেকে রবিবার দুপুরের মধ্যে সব শেষ করতে হয়। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, মোটা কোট, জুতোমোজা পরে পৌঁছে তারপর সব বাইরে খুলে ভেতরে যেতে হয়। ভেতরে কিন্তু পুজোর আনন্দ হৈ হুল্লোড় সরগরম। অপূর্ব সুন্দর সুন্দর নানান রকম বাংলার শাড়ি, দারুণ চোখ ধাঁধান ধুতি পাঞ্জাবী। বড়রা, বাচ্চারা সবাই এই দিনগুলোর আনন্দে মশগুল। কিছু কিন্তু বাদ ও যায় না। খুব ভাল ভাবে, নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো, সন্ধ্যারতি হয়, হৈ হৈ করে সবাই মিলে ভোগ খাওয়া হয়, অনুষ্ঠান হয়। সবাই মহানন্দে যোগ দেয়। বেশির ভাগ যখন ছুটিতে কলকাতা যায়, সব থেকে বড় কাজ হল পুজোর বাজার। প্রচুর সময় নিয়ে, নানান জায়গা ঘুরে, হাল ফ্যাশনের সব কেনাকাটা করে কলকাতার বিখ্যাত street food খেয়ে খুশী হয়ে বাড়ি ফেরা। সবার একটাই উদ্দেশ্য - পুজোর আনন্দ।

পুণায় বহু বছর হয়ে গেল, কিন্তু পুজোর সময় প্যান্ডেলে গিয়ে হৈ চৈ করাটা একটুও কমেনি। সত্যি বলতে কি, এই সব ব্যাপার আমার মতো কেউ পারবে কি না সন্দেহ। প্রচুর pandal hopping করি - গত বছর কুড়িটা পুজোয় গিয়েছিলাম, এবছর বেশী না করলে চলবে? প্রতি বছর প্যান্ডেলের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, শুনছি এ বছর নাকি চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছবে। সব জায়গায় প্রচুর লোক, নানান অনুষ্ঠান, আড্ডা, মজা, খাওয়া-দাওয়া, সব নিয়ে সত্যি এক অপূর্ব আন্নদের পরিবেশ। "এই তো বৌদি এসেছেন" শুনলেই কি ভালো লাগে।বহু পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়, আনন্দের কোলাহলে মাঝখানের বছরগুলো কোন ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারেনা।

তবে এখন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে তাল রেখে পুজো একেবারে আধুনিক ভাবে পরিচালনা করা হয়। সব কিছুই অনলাইন হয়ে যায়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তোলা প্রায় উঠেই গেছে। সবাই বাড়িতে বসেই চাঁদা পাঠিয়ে দেয়। এখন আর ধাক্কা খেয়ে, দোকানে দোকানে ঘুরে বাজার না করলেও চলে, অনলাইন এই পছন্দসই সব কিছু বাড়িতে চলে আসে। কোনটা ফ্যাশন দেখে নিয়ে শাড়ি, জিনস, ঘাগরা, - পছন্দ করে অর্ডার দিলেই কদিনের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। তবে ফ্যাশন যাই বলুক, শাড়ি হল পুজো প্যান্ডেলের বাহার। কলকাতা থেকে আনা, নানান রকম শাড়ি পরে, মহিলারা দারুণ গর্বিত ভাবে ঘুরে বেড়ান, এবং অল্প বয়সী মেয়েদেরও সেটাই পছন্দ। আর ছেলেরা কি পিছিয়ে থাকতে পারে? কক্ষনই না। তাদের জামাকাপড়ের বাহারও চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতন, প্রত্যেক প্যান্ডেলে ছোট ছোট দল করে জমজমাট গল্প, আড্ডা চলে। সঙ্গে লুচিমাংস,

সিঙ্গাড়া, চপ, মাছের ফ্রাই, মিষ্টি, বিরিয়ানি, কিছুই বাদ যায় না। পুজোর সময় কেউ ডায়েট করেনা।

কিন্তু আমি পুরোনপন্থী । অনলাইন কিছুই করি না। দশটা দোকানে গিয়ে পছন্দ করবো, গরমে ধাক্কা খাবো, দরাদরি করে দাম কমাবো, সব করে, সব নিয়ে দরজির কাছে যাব, তাকে বকাবকি করে সেলাই করাব - এসব না করলে পুজোর আমেজটাই আসেনা। তারপর রোজ সকাল বিকেল নানান জায়গায় গিয়ে খেয়ে দেয়ে আড্ডা হৈ চৈ ধুনুচি নাচ, সব করে, প্রচণ্ড হৈ হুল্লোড় করে পুজোর দিনগুলো আনন্দে ভরে নেব। জয় দুর্গা মাইকি জয়।

Jonaki Bhattacharya has been born, brought up, educated (Arts graduate from Miranda House) and married in Delhi and then lived in different parts of India; the last 45 years being in Pune. She is interested in every aspect of life and lives it on her own terms with great style!

Srijonee Mandal
Class VI, Euro School

সিলেটের দুর্গাপুজো এবং এক ভোজন রসিকের আক্ষেপ

- ড: মলয় দত্ত চৌধুরী

আমার ছেলেবেলা মানে ম্যাট্রিক পাস করা পর্যন্ত কেটেছে গ্রামের বাড়িতে। গ্রামের নাম শ্রীগৌরী। সিলেট বাঙ্গালী অধ্যুষিত এক প্রান্তিক বাসভূমি বরাক ভ্যালি উপত্যকার কাছাড় জেলার অন্তর্গত এই গ্রামটি। শ্রীগৌরী গ্রামে আছে শ্রীগৌরী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় - ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি আমাদের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে পনেরো মিনিটের পথ। আমাদের বাড়ি থেকে দৌড়ে দুমিনিটে রেলস্টেশন "রূপসীবাড়ি"। অন্যদিকে দুমিনিট দূরে বাস চলাচলের জন্য Trunk road যেটা চলেছে স্টীমারবাহী বরাক নদীর পাশ বেয়ে। পড়াশোনা ও যাতায়াতের উপর কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন আমার ঠাকুরদা ও তেনার সাঙ্গপাঙ্গ যে ভাবতে অবাক হতে হয়। ম্যাট্রিকুলেশনের পর আমার পড়াশোনা, দশ মাইল দূরে মহকুমা শহর করিমগঞ্জে। এই এলাকার একদিকে পূর্ববঙ্গ, একদিকে ত্রিপুরা রাজ্য। অন্যদিকে সোয়াশো মাইলের পাহাড়ী রেলরাস্তা ধরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার লামডিঙ হয়ে গৌহাটি অথবা বাস ধরে শিলং হয়ে গৌহাটি। এই সব রাস্তার বিশেষ করে রেলরাস্তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা আমার ভাষায় দুরূহ। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে খরস্রোতা নদীর পাশ দিয়ে রেলরাস্তা। ছত্রিশটা টানেল। পাহাড়ে অতি সুস্বাদু কমলালেবু আনারস আর মৌমাছির ঝাঁকেদের প্রাচুর্য। মাঝেমাঝে বুনো হাতির দল এসে যখন রেললাইন দখল করে তখন তেমনি ভয়ঙ্কর।

সব মিলিয়ে জীবনের প্রথম কুড়ি বছর - মানে স্নাতক পর্যন্ত আমার কেটেছে শ্রীগৌরী ও করিমগঞ্জে। ওই এলাকার লোকেরা পড়াশোনা, চলাফেরা ইত্যাদিতে যেমন খুবই উন্নত চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ ছিল, তেমনি ওরা গুরুত্ব দিত ধর্মাচরণ, পল্লীগীতি রচনা, ভাল ভাল পুরানো ঐতিহ্যকে

বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসে। ওখানকার দুর্গাপুজোর সময়টা আমাদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় সময়। একমাস স্কুল কলেজের ছুটি। তাই পুজোর কিছুই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল না। ওখানকার পুজো ছিল প্রবাসে বিশেষ করে পুনা শহরের পুজোর থেকে অনেক ব্যাপারেই অন্যরকম। ওখানকার লোকেরা যেকোনো সুখে দুঃখে মানত রাখত পুজোয় পাঁঠাবলি দিয়ে।

বাড়ীর পুজো হোক বা বারোয়ারি পুজো, অথবা কালীবাড়ি বা রামকৃষ্ণ মিশনের পুজো, প্রত্যেক পুজোতে প্রত্যেকদিন বেশ কয়েকটা পাঁঠাবলি হতো। মন্ত্র করে মায়ের কাছে পাঁঠাবলি দিতেন পুজোর প্রধান পুরোহিতমশাই নিজে। বলির পর পাঁঠার মাথার অংশটা নিয়ে যেতেন পুরোহিতমশাই, দেহটা থাকত উৎসর্গ করার জন্য। সেই পাঁঠার দেহ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে সেটা রান্না হতো আর উপস্থিত ভক্তরা ও গ্রামবাসীরা প্রত্যেকদিন প্রসাদ

পেত পেটভরা মাংসভাত। পুরোহিতমশাই যিনি মাথার ভাগ পেতেন তিনি সাধারণত এত প্রতিভাসম্পন্ন হতেন যে পাঁঠার গলার পুরোটাই চলে যেত মাথার দিকে, যাতে মাথার অংশটায় মাংস যতটা সম্ভব বেশী পাওয়া যায়। আমাদের বাড়ীর খুব কাছেই আমাদের পুরোহিতমশাইয়ের বাড়ী। ইংরাজী ভালো করে জানা তর্করত্ন উপাধি পাওয়া অতি সুপুরুষ এই পুরোহিতমশাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কিছুদিন সেনাবাহিনীতেও কাজ করেছেন। তিনি পুজোর সময় প্রায় প্রত্যেকদিন কুড়ি পঁচিশটা করে পাঁঠার মাথা পেতেন তার থেকে বেশ কয়েকটা অন্য পুরোহিতদের দিয়ে প্রত্যেকদিনই ডজন খানেক মাথা দিয়ে বাড়ী ফিরতেন। ফেরার পথেই আমার ডাক পড়ত ওনার বাড়ী যাওয়ার জন্য। আমি সেই সব চামড়া ও শিং সহ মাথাগুলো থেকে মাংস বের করে কেটে কেটে রান্নার উপযোগী করে দিতে দিতে রীতিমত পারদর্শী ছিলাম। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে পুরোহিতমশাইয়ের ছেলেমেয়েদের সাহায্য নিয়ে রান্নার উপযোগী মাংস বানিয়ে তার কিছুটা ওদের বাড়ীতে দিয়ে বাকিটা নিয়ে বাড়ী ফিরতাম। পুজোর প্রসাদ, তাই বাড়ীতে আমার এই সব কাজকর্ম নিয়ে বেশী গালিগালাজ শুনতে হতো না। গ্রামের বাড়ীতে খাবার ঠান্ডা করে রাখার ব্যবস্থা ছিল না। তাই সেগুলো সেদিনই রান্না করে নিতে হতো। অর্থাৎ পুজোর কয়েকদিন আমরা প্রচুর পরিমাণে মাংস খাওয়ার সুযোগ পেতাম। আমার মত ভোজন রসিকের কাছে সেটা যে কী প্রাপ্তি ছিল সেটা মনে হলেই এখনো মনটা আক্ষেপে ভরে ওঠে। এছাড়াও প্রায় প্রত্যেকদিন দুপুরে পুজোবাড়ী গুলো থেকে নেমন্তন্ন আসত দুপুরে খাওয়ার জন্য। খাবার হিসেবে থাকত প্রচুর মাংসসহ ভাত। তারপর চাটনী ও সবশেষে পরমান্ন। মাংস ভাত ও পরমান্ন প্রত্যেকদিন, আর চাটনীরই শুধু হতো রকমফের। আনারস, চালতা, আমড়া ও জলপাই দিয়ে চাটনী থাকতো বিভিন্ন দিনে।

প্রবাসে বিশেষ করে পুনা শহরে, পুজোর দুপুরে খাওয়া মানেই খিচুড়ি। আমিষ খাবার নৈব নৈব চ। সন্ধেবেলা খাবারের স্টলগুলোতে মাংসভাত অথবা আমিষ চপ কাটলেট নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে কিনে খাওয়ার কিছুটা সুযোগ আছে। এবং সেটাই পুজোর কয়েকদিন মাংস খাওয়ার একমাত্র উপায়। আমার মত ভোজন রসিকের কাছে এই ব্যবস্থাকে "দুর্গাপুজোয় এক আক্ষেপ" ছাড়া আর কিই বা বলতে পারি।

Malay Dutta Chowdhury started as a lecturer in Silchar, Assam and came to Pune in 1970. He completed his Ph.D. from NCL in 1975, went for post-doctoral research to USA. After teaching at Anna University, (Chennai) for a couple of years he returned to Pune to join the Mahindra group. At the age of 65, he retired as the Managing Director of Mahindra Composites Ltd. Now at 77, he leads a happy retired life, occasionally offering consultancy to Composites Technology and Business.

Shoumil Gupta
Class III,
Sri Sri Ravishankar
Vidya Mandir

Shoumitree Gupta
Class II,
Sri Sri Ravishankar
Vidya Mandir

অসামাজিক হওয়ার গাইড

- ইমরান

কী করবেন?

অ্যান্ড্রয়েড ফোন হলে ডাকডাকগো ব্রাউজার ইন্স্টল করুন। যত খোঁজ সব এতে করুন। ক্রোম ত্যাগ করুন। (আপেল ফোনেদের জন্য এই লেখা না। ওনাদের অসামাজিক হওয়া আর হলো না।) ফেসবুক ইন্স্টাগ্রাম টুইটার আরও যতেক সামাজিক মাধ্যম ত্যাগ করুন। ব্রাউজারে অ্যাডব্লক প্লাস লাগান, কোন অ্যাড দেখতে পাবেন না। হোয়াটস্যাপ এর বেশিরভাগ গ্রুপ ত্যাগ করুন। ফরওয়ার্ডেড মেসেজ পাঠিয়েদের ব্লক করে দিন। নিজের মামা হলেও।

টিভিটা দান করে দিন। কাউকে না পেলে ভেঙে ফেলুন বা বেচে দিন। খবর কাগজ একদম না। ক্রিকেট ছাড়া বাকি খেলা চলতে পারে (ইন্টারনেটে দেখবেন) । তাও যদি কেউ ক্রিকেট নিয়ে হ্যাজাতে আসে সি এল আর জেমস কোট করে চট করে ব্রিটিশ কমিউনিজমে ঢুকে যান। আর ঘাঁটাবে না।

অকারণে শপিং মলে যাবেন না। হাঁ করে দোকানের কাঁচ দেখবেন না। একান্তই যেতে হলে এসকালেটরের সামনে একটা বেঞ্চি পাকড়ে মানুষের ওঠানামা দেখুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারবেন সবাই আসলে নিজেদের ফোন বা অন্যের জামা দেখতে ওখানে আসে। কারণ বাড়িতে এত সময় নিয়ে কী করবে বুঝতে পারে না। এদিকে সময় বাঁচানোটাই জীবনের মূল উদ্দেশ্য ।

তাহলে করবেন টা কী?

এ বাদে যা খুশি করুন। ভালোবাসুন। সাইকেল চালান। বারান্দায় পুঁই শাক লাগান। সব্জি বাজারের দোকানীদের সাথে গল্প করুন। ফুটবল খেলুন। যা খুশি।

কেন করবেন?

কিন্তু এতসব কেন করবেন?

এটার দুরকম উত্তর দেওয়া যায়। একটা উত্তর একটু বড় করে ফাঁদতে হবে। অন্যটা এক্ষুনি দেওয়া যায় - জীবন খুব ছোট্ট, কাজ অনেক বেশি। বা হিপোক্রাতেসের বিখ্যাত বয়ানে -

Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile

এবার বড় উত্তর। আমি আপনি প্রত্যেকে এই বাজারে হয় ইডিওলজির গ্রাহক কিংবা বিচ্ছুরক। ইডিওলজি বলতে আবার শুধু পলিটিক্যাল বা রিলিজিয়াস বুঝবেন না যেন। ইডিওলজি তার থেকে সন্তর্পণে চামড়ার নিচে সেঁধোয়। কোথায় খাবেন, কোথায় খাবেন না, কী পরবেন কী বেন না, কী দেখবেন শুনবেন কী বেন বেন না। কাজের লোককে কী বলে ডাকবেন, কীভাবে আদব কায়দা মেনে ঢপ দেবেন এসকলই ইডিওলজির আওতায় পড়ে। এইরকম ইডিওলজির জালে আটকে পড়ে আমরা ফ্রীতে সেগুলোকে প্রোপাগেট করে চলেছি। যেমন জিন প্রোপাগেট করে বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে, যেখানে আমরা শুধুই মাধ্যম বা উপলক্ষ্য মাত্র। কালচারও (রবীন্দ্রনাথ নয়) এইভাবে প্রোপাগেট করে বলে একটা থিওরি আছে। যেখানে কালচারাল ট্রান্সমিশনের ইউনিটকে বলে মীম (meme), gene এর মত। এমনকি কারও কারও মতে বিড়ালরা তাদের বিড়ালসুলভ কিউটত্ব দিয়ে আমাদের বশ করে তাদের বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে। মানে মোটেই আমরা বিড়ালদের পুষি না, বিড়ালরা পোষ মানার ভান করে আমাদের ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ভাবুন একবার!

যাই হোক, এই জালে জড়িয়ে আমরা দেখুন প্রতিদিন আট ঘন্টার থেকে অনেক বেশি শ্রম দিচ্ছি গ্লোবাল অর্থনীতির (ক্যাপিটালিজম শব্দটাকে কায়দা করে এড়িয়ে গেলাম। ও নিয়ে কথা বললে লোকের বদহজম হয়) জন্য। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। বাড়ি ফিরে এসে আপনি বিজ্ঞাপনের ফাঁকে ফাঁকে কিছু একটা গান বা ফিল্ম দেখার চেষ্টা করছেন। এদিকে বিজ্ঞাপন সাব কনশাসলি শ্যাম্পু, ক্যালসিয়ম বড়ি, ডিজেল গাড়ি বা ম্যাট্রেস বেচার ফিকির করছে। আপনি বুঝতেও পারছেন না কেন আপনার এত অস্থির লাগছে, কিন্তু ঠিক ততটাও অসহ্য লাগছে না যে একেবারে ফেটে পড়বেন। কারন ঠিক সময়মত আপনাকে প্রশমিত করতে পরের গানটা বা ফিল্ম এর পার্টটা ফিরে আসছে। যেগুলো আপনাকে ঠান্ডা করে রাখতে গোঁজা আছে এই বিজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে। সোস্যাল মিডিয়ায় এ ছাড়াও অন্য আপদ - মেশিন লার্নিং, বাঙালি কবি ও ফটোগ্রাফার। কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা, আইটি সেল, কিংবা সরু কবি। ত্রাহি ত্রাহি। আপনি শুধুই ডেটাপয়েন্ট। ওখানে প্রতি কীবোর্ডে একজন লেখক। আর এই চক্করে ফ্রীতে ডেটা প্যাক পেয়ে আপনি ফ্রীতে কঠোর শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন ঘুম নষ্ট করে। যার কিনা বিকল্প আছে। যে বিকল্পের কথা উপরে লিখেছিলাম।

এতে কী হবে?

উপরের ত্যাগের পথে কিছুদিন চলে দেখুন, শপার্স স্টপ আপনাকে কোন জামা বেচবে বুঝতে পারবে না। লোকের চুলের স্টাইল দেখে বুঝতে পারবেন না সেটা উঠতি না পড়তি। টেলিকলাররা কল করে আপনার গলা শুনে হেসে ফেলবে। কোকা কোলার সাথে কুলনেসের সম্পর্ক কিছুতেই কেউ বোঝাতে পারবে না। রাস্তার বড় বড় হোর্ডিংগুলো মানুষের ইমোশনকে কেমন করে ম্যানিপুলেট করছে বুঝে গিয়ে ফিক ফিক করে হেসে উঠবেন। মোটকথা, তখন আপনি একটা প্যারালাল ইউনিভার্সে বাস করছেন। দরজার সরু ফাঁকটা - যেখান দিয়ে অনবরত ঢুকে আসতে থাকে ডেটা প্ল্যান, ধামাকা অফার বা ক্রেডিট কার্ডের লিফলেট - ছাড়া যাদের মধ্যে আর কোন যোগাযোগ মাধ্যম নেই। বাজার চলতি স্রোতে আপনার মিস্ত্রাসেলনিস্পৃহ ডিসকাউন্টকুপন-অবিচল এই আড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকায় দেখবেন সকলেই কথা বলছে কিন্তু আপনার কানে কিছুই সেসব পৌঁছচ্ছে না। আপনি একা একটা পাহাড়ের কুয়াশায় দাঁড়িয়ে আছেন। আহ সে যে কী শান্তি!

ইমরান, কমবয়সে 'কেন' জানতে বেশী আগ্রহী ছিল, এখন- 'কীভাবে'। দর্শনের ইতিহাস, দর্শন ও ইতিহাস পড়তে উৎসাহী। হিমালয়ে ট্রেকিং করতে ভালোবাসে।

Siddharth Ghosh
Class VI, Ryan International School, Pune

How I Want A SMART CITY!

- Neel Roy

Let us talk about a smart city,

With full time wifi and super connectivity,

Without utilising much money from our kitty,

We can make any city a smart city.

We can build buildings green and clean,

To give our city a splendid sheen,

By adding a few extraordinary things,

Our city will be fit for kings.

By building supplies with waters azure,

Our city will be awesome, I am sure!

With super traffic management 24 hours,

Our city will glow with the headlights of cars.

If we pledge to make our city smart,

Our city will be full with craft and art.

With convenient shops 24/7,

Our city will be like heaven.

With good treatment in good hospitals,

Our fellow citizens can bring laurels.

With full time running efficient banks,

Our city will be in the best of ranks.

If we can fit wind mills,

We can see happiness from all the window sills.

Last but not the least, the CCTV footage,

There will be safety on every edge.

This is how I want a smart city to be,

We couldn`t make it yet, what a pity!

I hope the future citizens would be wise enough

To make our city smart, not dirty and rough.

Neel Roy
Class VI,
Vibgyor High School,
Pune

I Am Death

– Debolina Bhattacharyya

As a tear slid down my fire-burned skin,
you spoke to me.

Your laughter - scathing

Your voice - violating

I walked from the flames - reborn

The bodies, mere screeches of terror

Their mutilated faces - harbingers of devastation

Your smile scalds

Them - I offer as vengeance

I scar my scorched souls. I bleed

I destroy

I burn. I mutilate

I am immortal

I am Death

The night embraces me

The darkness devours me…

Debolina Bhattacharyya
Class X, The Bishops' Co-Ed School,
Kalyani Nagar, Pune

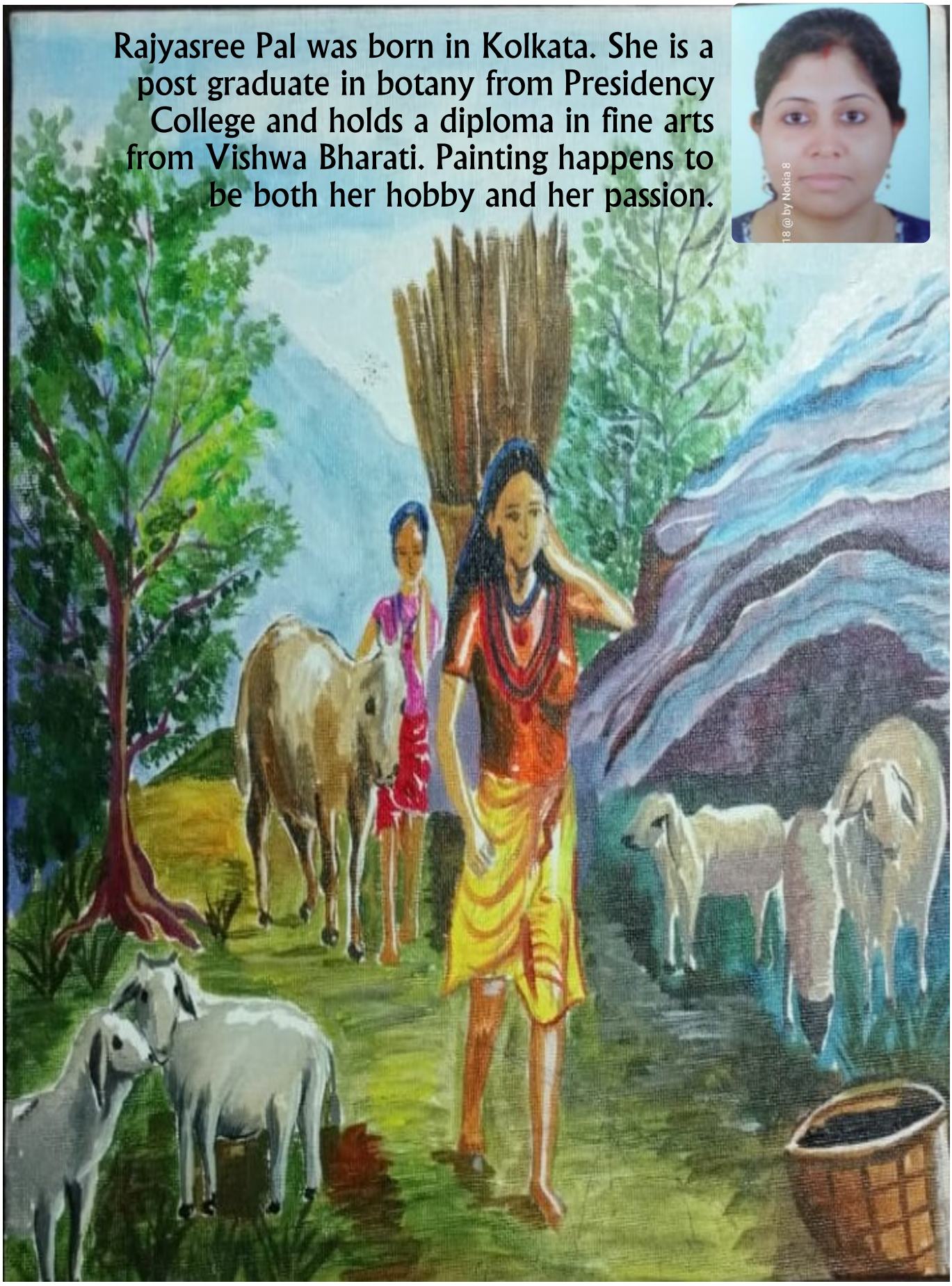
Rajyasree Pal was born in Kolkata. She is a post graduate in botany from Presidency College and holds a diploma in fine arts from Vishwa Bharati. Painting happens to be both her hobby and her passion.

গল্পটি।

- অমিয় ষড়ঙ্গী

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙা চোখে গল্পটির শুরু,
মাথার শিয়রে রাখা স্মার্টফোনে
ফরোয়ার্ড করা মজার সব পোষ্ট
বন্ধুরা শেয়ার করেছে ভালোবেসে
আমার কিছু দন্তজ পুলকমাখানো ছবিতে

লাইক ও করেছে দরাজ হাতে।
সন্দেহের চোখ রগড়ে নিয়ে দেখি,
সেই চটকানো হাসির ফোয়ারা সমেত
শেয়র্ড করা মুখরোচক সব কাহিনি,
সঙ্গে একটি সৌভাগ্যের চাবিকাঠির সন্ধান ও পেলাম
রক্তমুখী মা কালীর ছবির তলায় ঘোষণা
একটা লাইক করলেই আজ
কিছু একটা ভালো হবার সম্ভাবনা।
দেরি না করে পড়ে যাই রুদ্ধশ্বাস,
আর পড়েই বুঝতে পারি
লোমহর্ষক অনেক ষড়যন্ত্রের ও

কে বা কারা করতে চলেছে পর্দা ফাঁস।

জানলাম
ঋণী কৃষকের আত্মহত্যা, তাদের দুর্দশা,
জানলাম মানুষের অকাল মৃত্যুর কারন নাকি হাসপাতালে
ভীনরাজ্যের ডেঙ্গির মশা,
কিভাবে চুরি হয়ে গেল ব্যাংকের টাকা,
বিভেদের বিষ ছড়াচ্ছে কারা,
আর কারাই বা বলছে
ভারত তেরে টুকড়ে হোঙ্গে, এইসব।
তাবৎ সেই ঘটনা এবং ষড়যন্ত্রের জবাব চাই
বিষয় বস্তু এখন সেটাই।
আদ্যান্ত নিজের মত এবং সন্দেহ জানিয়েছেন
অনেক বড় বড় রাজনৈতিক নেতা
কিংবা হেলেপড়া পন্ডিতম্মন্য
কোন বিশেষ সংবাদদাতা ।

মনোযোগ দিয়ে বারকতক
মজাদার কমেন্ট গুলো পড়ার পরের ঘটনাঃ

বেলা বাড়ার সাথে সাথে ক্রমশঃ
তোলা সন্দেহগুলো আরো গাঢ় হয়ে
প্রবল আকার নিয়ে ফেলল,
অনায়াসেই সেগুলো সাগ্রহে
ঘিলুর হার্ড ডিস্কে তিন কোয়ড্রান্ট জুড়ে
ঢুকেও গেল সটান আমার মাথায়,
ক্ষেপে একদম টং হয়ে পড়ায়
আর একটা কিছু করা দরকার ভেবে ভেবে
মরছি এখন বিবেকের জ্বালায়।

হয়েছি একবগ্গা,
বোধশক্তি নামক প্রোসেসারটি হয়েছে
আপাত বিকল, নড়বড়ে, নয় ছয়
হাজার কম্যান্ড দিলেও নিচ্ছে না কিছুই ঠিকমত
অটো মোডে চলছে বোধহয়।
এই ধার করা বুদ্ধি, বিবেচনা এবং মতামত
চমৎকার ইনপুট হয়ে
ভরে গেছে আমার ধোলাই করা
এই নিরেট মাথায়,
তারা প্রকাশ পাচ্ছে আর দিব্যি
শেয়র্ড ও হয়ে চলে যাচ্ছে
নিয়মিত নতুন সব গল্প হয়ে
মাফ করবেন, এই খবরি দেরই দয়ায়।

ডঃ অমিয় ষড়ঙ্গী প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সৈন্য বিষ্ফোটক বিভাগের অবসর প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক এবং বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। কবিতা পড়া কিংবা শোনা তাঁর একটা শখের বিষয় আর লেখাটা নিতান্তই অবসর সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য।

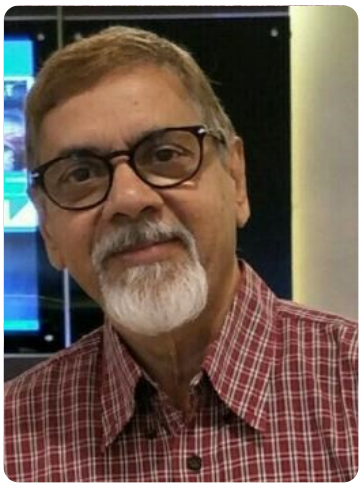

বিদেশে রাস্তায়।

- রমাব্রত ভট্টাচার্য

বিদেশে রাস্তায়
চলতে ফিরতে পদেপদে
অগুনতি কবিতার সাথে দেখা হয়।
যে নদী টি কোন দিন চোখেও দেখিনি
তার জলোচ্ছ্বাস যেন শুনি
বুকের গভীরে।
যে শহর আগে আমি সপ্নে ও দেখি নি
তার সুরম্য প্রাসাদ আর সারি সারি
অট্টালিকা পথ মাঠ বন
মুঠোফোনে বন্দি যত ছবি:
হঠাৎ বন্ধুর মতো কাঁধে হাত রাখে
কুশল শুধায়।

যাকিছু দুচোখ ভরে নিত্য দেখি
এই কানাডায়
সব কিছু ভালো লাগা কবিতার মতো
মনে দ্যুতি পায়।

রমাব্রত ভট্টাচার্য DRDO তে নানা প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন। তার মধ্যে পিনাকা রকেট নির্মাণ এক উল্লেখযোগ্য অবদান। ছোট বেলা থেকেই কবিতা লিখতে ও আবৃত্তি করতে ভালোবাসেন।

কল্পনা

- সৌমিত্র মন্ডল

আমার আছে স্কুলের পড়া
মায়ের আদর ও শাসন কড়া
বিকেল বেলায় দল পাকিয়ে
ক্রিকেট কিম্বা কেরাম খেলা।

সাত সকালে ঘুম চোখেতে
স্কুলের জন্যে তৈরী হওয়া
মিসের বকায় জানলা থেকে
বইয়ের পাতায় নজর দেওয়া।

রাতের খাবার খাওয়ার শেষে
চাঁদের আলোয় শোবার ঘরে
আমার ভ্রমণ চাঁদের দেশে
আফ্রিকাতে বা সাত সাগরে।

কল্পনাতে বাধন কিবা
সোনার তরী গাং- এর জলে
মনের সাথী গানের সুরে
ভাসিয়া যাই অচিন কূলে।

Soumitra Mandal is an IT manager interested in football, arts and literature. He believes PPBP e-zine will provide a channel for our kids to be in touch with our beloved mother tongue.

Ananya Basu
Class VI,
Vibgyor High School, Pune

মধ্যবয়েসের মনস্তত্ত্ব

- মৌমিতা মন্ডল

বয়েস বাড়ছে, আয়নার সামনে দাড়ালেই - পাকা চুলের উঁকি আর চোখের নীচের ভাঁজ তা জানান দিচ্ছে। সেদিন তাই সাত- পাঁচ না ভেবেই supermarket এ Beauty n Health section এ ধর্না দিলাম। Wrinkle -free cream থেকে শুরু করে Herbal supplement for weight loss... সবার উপর এক নজর বুলিয়ে ফেললাম। আর একটু অংক ও কষলাম । আর অংক কষতে গেলাম বলেই খালি হাতে বাড়ি ফিরলাম। (যদিও Egyptian magic বলে একজন প্রায় কাবু করে ফেলেছিল- নামের মাহাত্ম্য আর কি!) তবে খুব শিগ্গির ফিরে আসার ইচ্ছে রইল; অংকটাকে balance করে। তত দিন ঘরোয়া উপায় ই চলুক।

কিন্তূ সত্যি কথা বলতে এ ছাড়া ও আরো visible change আছে যা ওই health and beauty section এর উর্ধ্বে।

পেট আর কোমর মিলে টায়ার- সমান হয়েছে, যা di et কিম্বা simple- walk এ ইদানীং কিছু তফাত করছে না। মুখের গঠনটা ঠিক কাকিমা- মাসিমা মার্কা হচ্ছে। চোখ গুলো আরো খূদে হয়ে আসছে, যত fat ঠিক মুখে। দিদি বা বৌদি ডাক সচরাচর শোনা যাচ্ছে না, তা টাইট jeans- ই পরি কিম্বা কায়দা- গলাওয়ালা ব্লাউজ সহ সাড়ী!

এর পরে আছে এরকম কিছু change যা শুধূ আমিই টের পাই। যেরকম আজ হাঁটু ব্যথা তো কাল কোমোড়ে, পরশু দাঁতে. তো তরশু পিঠে.... কিন্তূ রোজ কেউ না কেউ আসে বোঝাতে - এই তো সবে শুরু... এবার থেকে "চলছে চলবে"।

রাসায়ণিক পরিবর্তনের মধ্যে অন্যতম হল হজম শক্তির demotion। মনের সুখে যে খান কয়েক মিষ্টি খাবো - সেখানেও গেরো। রক্তে চিনি - hereditary! চপ- কাটলেট- পেয়াঁজি ডীপ ফ্রাই করতে গেলে ও যেন বুকের ভিতরটা আনচান করে, কড়াইতে তেলের পরিমান দেখে। তবে লোভটা এখোনো control এ আসেনি। রেস্টুরেন্টে দিব্বি চালিয়ে যাচ্ছি ..... এই ভেবে যে তেলের মাত্রা আমায় দেখতে হয়নি। তবে আমি নিশ্চিত.... সেই দিন ও আসছে যখন home-made ফূডেরই জয়- জয়কার করবো।

এখানে ও বিরাম নেই- আমার সব চেয়ে প্রিয় ঘুম, সেও বাদ সাধছে। সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকী weekend এর, যে একটু বেশী খণ ঘুমাবো দুটো দিন, কিন্ত বডি- ক্লক এমন সেট হয়ে বসে আছে যে

এলার্ম না বাজলেও চোখ আপনা থেকেই খুলে যায়। রেশ টাকে ধরে রাখার জনই আটটা অবদি বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকি।

ধৈর্য কাকে বলে ভুলে মেরেছি। মেজাজ খিটখিটেতরর দিকে। বাচ্চাদের উপর যখন রেগে চিৎকার করি, নিজের কানকেই নিজের বিশ্বাস হয় না, ভাবি এ কার গলা? আর আজকাল অজুহাৎ দেবার জন্য ভুলে গিয়েছি বলতে হয় না.... সত্যি সত্যিই ভুলে যাই।

এত সবেও হচ্ছিল না, যোগ দিল আবার Facebook, WhatsApp.... Profile picture কোনটা লাগাবো! তবে আমি ও কম যাই না, বুদ্ধি করে বাচ্ছাদের ছবি দিলাম set করে। comments নিয়ে নো মাথাব্যথা !

নাহ্, একটু বাড়া- বাড়ি রকম depressing কথা- বার্তা বলছি। একটু positive sides ভাবা যাক। হুম্, আজকাল নিজেকে বেশ experienced বলে মনে হয়। সব বিষয়ে অল্প- বিস্তর কথা চালিয়ে যেতে পারি। কোথাও জ্ঞান দেবার সুযোগ পেলে বিলকুল ছাড়ি না। আর মজা লাগে, যখন লোকজন তা খুব মন- সংযোগ করে শোনে। চট করে doctor এর কাছে ছুটি না। বেশী বাইরে খেয়ে পয়সা নষ্ট করি না । Movie review ভাল এলে তবেই theatre এ দেখতে যাই। যেমন লোকজন কে ভালো বলতে ভাল লাগে তেমন ভুলের প্রতিবাদ করতেও পিছু হটি না। আসল কথা হল এখন নিজের উপর অনেক বেশী আস্থা।
আর...আর...আর romantic গান শুনতে ঠিক অতটাই ভাল লাগে যা সেই আগে লাগতো।
বাহ্! romance বলতেই মনটা বেশ চনমনে হয়ে গেল তো!

তাহলে আর বয়েস নিয়ে, আমার কী এত শোক? জীবনের মূল জিনিস গুলো সব যথা স্থানে সুরক্ষিত।

" কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি"

Moumita Mondal is a home front manager who enjoys her responsibilities as mom and wife. Between varied tasks she reads, listens to music, gossips, tries new recipes, learns new skills and grabs opportunities like this to full-fill her bucketlist... which seems to keep on growing.

একাঙ্গী

- চন্দ্রচূড় দত্ত

লোকটা চেয়ে আছে একদৃষ্টে। একমুখ দাড়ি, উস্কোখুস্কো চুল, পরনের জামাকাপড় নোংরা। গাড়ির দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোলাটে চোখে ফুটপাতটা দেখছে। এমনভাবে দেখছে যেন ফুটপাত, তার তলার সিমেন্টের মশলা, তার নিচের মাটি, তার নিচের গাছপালার শেকড় বাকড় ছড়িয়ে শতাব্দী প্রাচীন সভ্যতার কঙ্কালের অবশেষ অব্দি দেখতে পাচ্ছে। একদৃষ্টে দেখেই যাচ্ছে। আস্তে আস্তে নড়ছে লোকটার নিচের চোয়াল।

ফোনটা বেজে উঠলো। লোকটাকে কেউ ফোন করেছে। হঠাৎ চমক ভেঙে লোকটা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সস্তা চীনে ফোনটার স্ক্রিনে ফাটল ধরেছে। কে ফোন করছে বোঝা যায় না। হিন্দিতে কথা বলে লোকটা। হ্যালো। পানমশলা ভরা মুখ, সামলে কথা বলে। পিচ করে একটু ফেলে কথা চালায়। হ্যাঁ সাহেব। বলুন। আমি এসে গেছি সাহেব। আচ্ছা ঠিক আছে। আসছি দু মিনিটে।

ফোনের ওপর থেকে সম্ভবতঃ সামনে কোনো একটা সোসাইটির ভেতরে আসার অনুরোধ আসে। লোকটা ফোন কেটে দেয়। কোথায় চললে? পাশের ফুটপাতের পানওয়ালা জিগ্যেস করে। এই তো মোড়ের সোসাইটিটায়। ও! তোমার পানমসলার দামটা মিটিয়ে দিয়ে যাই। লোকটা নোংরা প্যান্টের পকেট হাতড়ে খুচরো পয়সা বের করে। পানওয়ালার বকেয়া চুকিয়ে দেয়। তারপর গাড়িতে বসে। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে একটু এগিয়ে আবার দরজা খুলে পিচিত করে খানিকটা থুতু ফেলে দেয়। গাড়ি ধোঁয়া উড়িয়ে চলতে থাকে।

লোকটার বাড়ি এই শহর থেকে অনেক দূরে। ট্রেনে দেড়দিনের পথ। সাধারণ কামরার গরুছাগলের মতো ভিড়ে, ঘাম, পেচ্ছাপ আর পচা খাবারের গন্ধে দেড়দিন মনে হয় অনন্ত নরকযন্ত্রণার মত। লোকটার বউ একবার এসেছিল। ওই ট্রেন আর তারপর এই শহরের বস্তির ঘরে দু' রাত কাটিয়ে একরকম পালিয়ে গ্রামে ফিরে গিয়েছিল। ওই

গ্রামে এসব ওলা ফোলা কেউ বোঝে না। সবাই জানে লোকটা গাড়ি চালায়। লোকটা বউকে খুব ভালোবাসে। গেলবার ভালো ফোন কিনে নিয়ে গিয়েছিল। জিও সিম লাগিয়ে। যত্ন করে শিখিয়েছিল কেমন করে ফোন করতে হয়। হাটসাপও শিখিয়েছিল। একটা দুটো ফটোও তুলেছিল। ঘরে তখন ঘুমোচ্ছিল ছেলেমেয়েদুটো। বাড়ির পেছনে খোলায় বসে বউ এর সাথে গল্প করছিল লোকটা। কি সুন্দর ঠান্ডা একটা হাওয়া

দিচ্ছিল মাঠের দিক থেকে। মনে হচ্ছিল বৃষ্টি হবে। দাদা একটু তাড়াতাড়ি করুন না। রাস্তা তো খালি। লোকটার চমক ভাঙে। আবার। আজ বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। গাড়ির স্পিড বাড়ে। সকাল থেকে সবে তিন নম্বর। এখনো তেলের খরচ ওঠেনি। লোকটার কপালে ভাঁজ পড়ে। নাঃ, ফালতু চিন্তা করছে সকাল থেকে। পেটে টান পড়লেই এসব চিন্তা পালিয়ে যায়। আড়চোখে একবার সওয়ারীকে দেখে নেয় লোকটা।

মোবাইলে লেপ্টে আছে। মনে হয়না রাগ করেছে।

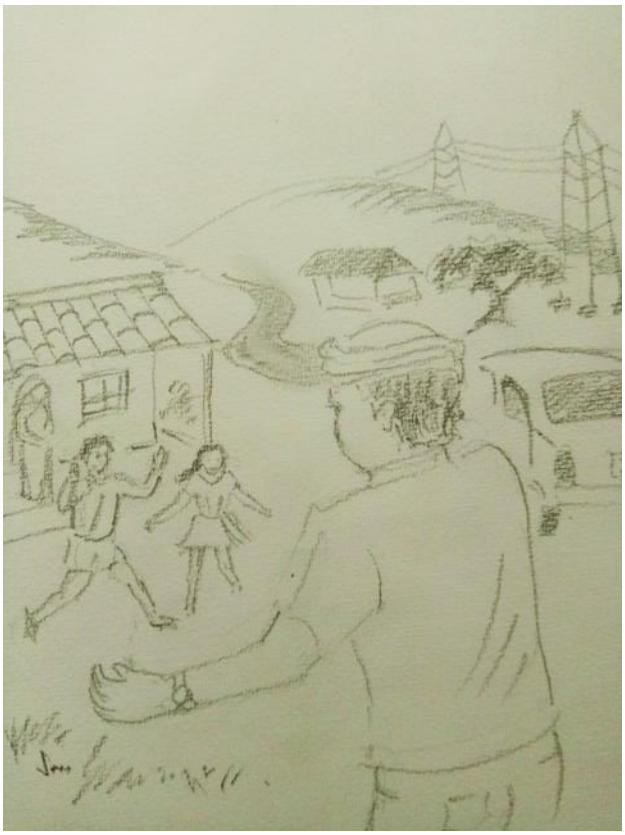

রেটিংটা আবার কমিয়ে না দেয়। কত যে ফিকির করেছে এই সব কোম্পানিগুলো। ট্যাক্সি কে আবার ক্যাব বলে!

পিরিং পিরিং করে বেজে ওঠে মোবাইলটা। পরের বুকিং। যাক শালা! সকালের শনিটা কেটেছে। বুকিংটা চট করে নিয়ে নেয় লোকটা। সক্কাল সক্কাল দুটো বুকিং বাতিল করেছে দুটো গ্রাহক। ব্যস! তারপর থেকেই ঢুঁ ঢুঁ। ঝাড়া দুটি ঘন্টা নষ্ট। গাড়িতে যে বসেছিল তার গন্তব্য এসে গেছে। তার মধ্যেই পরের জনের ফোন আসে। হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ স্যার...ইয়েস স্যার... আসছি স্যার। ড্রপ হয়ে গেছে। আসছি। দু মিনিট। ফোন কেটে যায়।

একেকজন মানুষ একেকরকম। তবু কোথাও যেন একটা ছাঁচ আছে। এই যেমন লোকটার সওয়ারীরা। সবাই আলাদা। টাকাপয়সার জোর আলাদা, দেখতে শুনতে আলাদা, ওঠাবসা আলাদা। অথচ কোথাও আবার একরকমও। ফোন করেই বিশ্বের তাড়া, গাড়িতে বসেই মোবাইলে লেপ্টে যাওয়া, ফোন এলে চাপাসুরে কথা মানেই গালফ্রেন্ আর ‘ বলো! কি হলো?’ মানেই বউ, একটু আস্তে চললেই ‘ কি হলো রাস্তা তো ফাঁকা’, নামার সময় ফিরেও না তাকানো - ভেতরে ভেতরে কত যে এক এক। ভাবাই যায় না। মাঝে মাঝে তলিয়ে ভাবতে গিয়ে লোকটা খেই হারিয়ে ফেলে। উপরওয়ালার চালাকিটা ঠিক ধরতে পারে না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর গাড়ির কাঁচে টোকা পড়ে। লোকটা একবার পেছন ফিরে দেখে একটি মেয়ে দরজা খুলে দেওয়ার ইশারা করছে। দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলেও ভেতরে ভেতরে ছটফট করে ওঠে লোকটা। কে ও? ও কে? দরজা খুলে দেয়। মেয়েটা গুছিয়ে বসে। অভ্যাসে যন্ত্রচালিতের মত লোকটা গাড়ি ছেড়ে দেয়। কিন্তু ফোনে যে কথা বলেছিল সে তো ছেলে। এরকম অবশ্য হতেই পারে। কিন্তু লোকটার বিশ্বাস হয় না। ও কি সত্যি? লোকটা বার বার আয়নায় মেয়েটাকে দেখতে চায়। পারে না। এমন ভাবে বসেছে মেয়েটা। আরো যেন জানলার দিকে সরে গিয়ে মোবাইলে লেপ্টে আছে। এত তোলপাড়েও লোকটার হাসি পায়। কিরকম এক এক না? হঠাৎ লোকটার মনে হয় ও কল্পনা করছে। কোন মেয়ে তার গাড়িতে বসেনি। ওরকম কোন মেয়ে তার গাড়িতে বসতে পারে না। হ্যাঁচকা ব্রেক মেরে গাড়ি থামিয়ে দেয় লোকটা।

কি হল? গাড়ি থামালেন কেন? মেয়েটা আস্তে করে বলে। লোকটা পেছন ফিরে মেয়েটাকে দেখে। আপনি আছেন? বলতে চেয়েও বলতে পারে না। জড়ানো গলা লোকটার, ঘড়ঘড় আওয়াজ হয় খালি। মেয়েটা বলে গাড়ি চালান। মেয়েটাকে ভালো করে দেখে লোকটা। ওই। ওই সে। আর কেউ হতেই পারে না। লোকটা সামনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয়।

ঠান্ডা হাওয়াটা তার মুখে ঝাপটা মারছে। তার মধ্যেই চাপা গলার চিৎকার। কোথাও কি আগুন লাগলো? গরমের দিনে শুকনো ঘাসে ছাওয়া বাড়িতে আগুন লাগার ভয় থাকেই। লোকটা বউকে ছেড়ে দৌড়ে যায়। মনে হল বেশ কিছু লোক ঢুকে পড়েছে তার বাড়িতে। আগুন কি তবে তার ঘরেই? ছেলেমেয়ে দুটোর কিছু হলো না তো? একটা লাঠির ঘা এসে পড়ে। লোকটা বুঝতে পারে না। দমাদম লাঠি পড়তে থাকে। বিছানার দিকে তাকিয়ে লোকটার ভীষণ কষ্ট হয়। মেয়েটার উপর হামলে পড়েছে কয়েকজন। ছেলেটা পড়ে আছে একপাশে। চিৎকার করতে থাকে লোকটা। লাঠির পর লাঠি পড়তে থাকে।লোকটা চিৎকার করতে চায়, পারে না।

মেয়েটা চিৎকার করছে। বাঁচাও। বাঁচাও। একজন পুলিশমতো কেউ গাড়ির জানলা দিয়ে চেপে ধরেছে তার হাত। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গাড়ি থামিয়ে দিতেই অনেকগুলো লোক তাকে বের করে। কিল। চড়। লাথি। ঘুষি। অনবরত। এরই মধ্যে মেয়েটার চিৎকার শুনতে পায় লোকটা। আতঙ্কে চিৎকার করে কথা বলছে মেয়েটা। বারবার আয়নায় আমায় দেখছিল। হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে দিল। পেছন ফিরে আমায় এমনভাবে দেখছিল - ভয়ে আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছিলো না। মাতাল! লম্পট! মেয়ে দেখলেই ছোঁক ছোঁক না?

লোকটা হাসছে। মার খাচ্ছে তবু কালো হয়ে যাওয়া একটা চোখের ফাঁক দিয়ে মেয়েটাকে দেখছে আর হাসছে। এরকমই একটা ভিড় সেদিন লোকটাকে মারছিল। আজও মারছে। সেদিন লোকটার মেয়েটা বাঁচেনি। আজ লোকটার মেয়ের মতো দেখতে একটা মেয়েকে একইরকম দেখতে একটা ভিড় বাঁচাচ্ছে। উপর উপর এক এক। অথচ ভেতর ভেতর আলাদা আলাদা। উপরওয়ালার খেলাটা লোকটা খানিকটা ধরতে পেরেছে।

লোকটার চোখে জল, কিন্তু হাসি আর থামছেই না।

চন্দ্রচূড় দত্ত নরেন্দ্রপুরের প্রাক্তন ছাত্র চন্দ্রচূড়ের নেশা নাটক ও বাংলা লেখালেখি। পড়াশুনা আর চাকরি – বেশির ভাগ সময় প্রবাসে কাটানোয় প্রচুর মানুষকে চেনার,কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়;লেখালিখির কাঁচামালের যোগান আসে সেখান থেকেই।

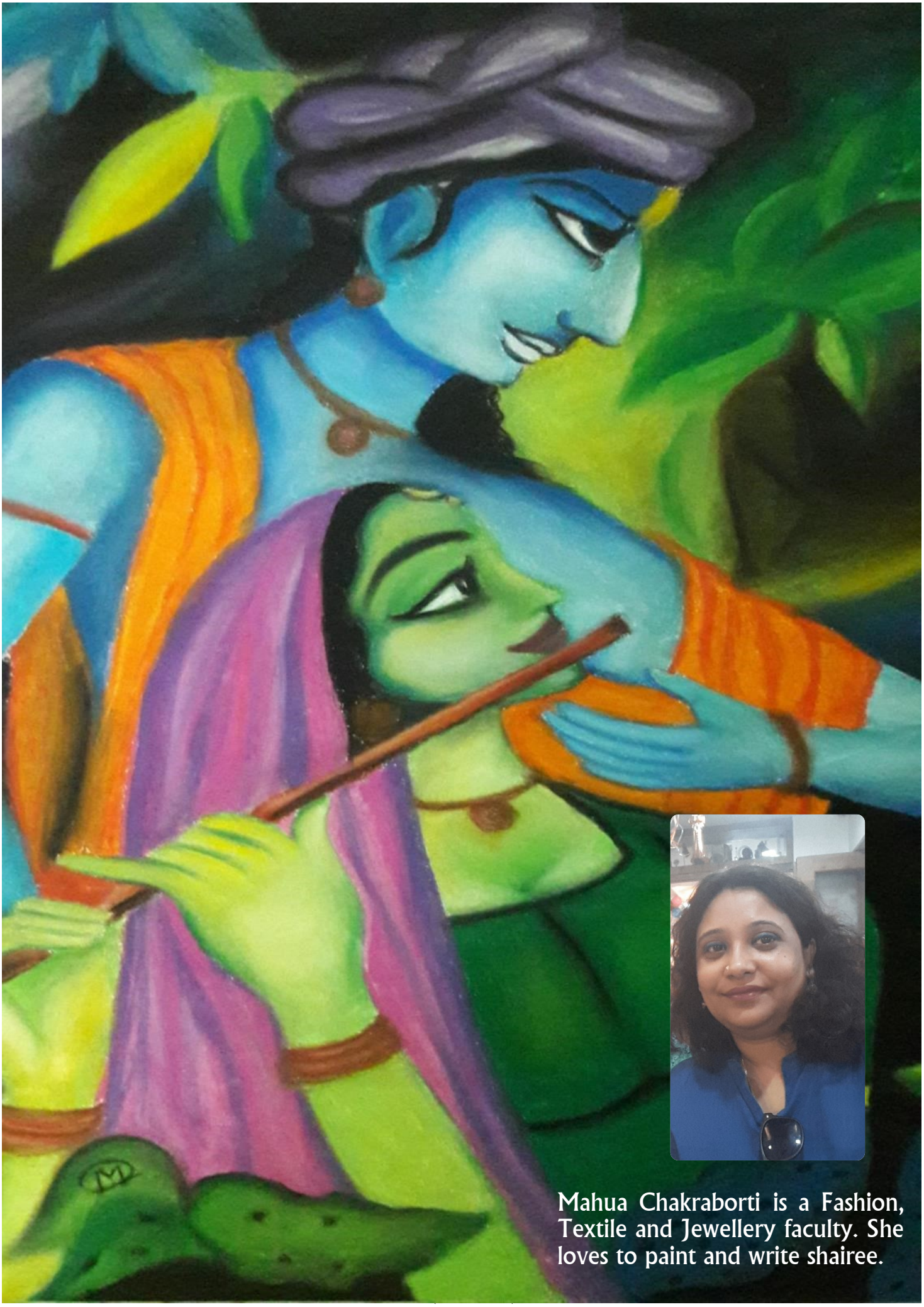

Mahua Chakraborti is a Fashion, Textile and Jewellery faculty. She loves to paint and write shairee.

কিস্যা ভুতো কা।

- বর্ণালী মুখার্জী

আমার নাম জন। আসলে জনি বা জনার্দন অমর-আকবর বা অ্যান্টনি যা কিছুই হতে পারতো কিন্তু জন নামটা আমি নিজে নিয়ে নিয়েছি। আমি ফুটপাত বালক। বাপ মায়ের ঠিক নেই, এই বারোতেই বেশ লায়েক। দু এক ডবকা আন্টি আমাদের ডেনড্রাইট ছাড়িয়ে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের কোণায় ম্যারপ বেঁধে, আলো জ্বালিয়ে, রাতবিরেতে টর্চার করতো, ঠিক কায়দা করে সটকে গেছি। পার্কস্ট্রিটের কবরখানা থেকে টাটকা ফুল হাপিশ করে ট্রিঙ্কাসের সামনে বেচে দিই। সিগন্যালে গাড়ি আটকালো ধরুন, গাড়ির ভিতর এট্টু আধটু, ইয়ে- মানে -চুম্মা চাপাটি চলছে আর কি, আমি অমনি জানলার কাঁচে নাক সাল্টিয়ে ঠকঠকাই- - - তারাও সস্তার বিদিশি ফুল আদিখিলা করে কিনে ফেলে। আমার রাতের মহফিল জমে যায়। গোপাল আমার সাকরেদ। ওকে বলেছিলাম -' কবর স্তানে ঘুরছিস যখন একটা ইংরিজি নাম নে। রকি!'

গোপালের মা কার একটা বাচ্চা ফুটপাতে ফেলে রেখে ভিক্ষে করে। পার্ক হোটেলে

ঢোকার মুখটাতে। ওদের নাকি ভেটকিপুরে দুবিঘে জমি ছিল।তাই তার বেশ জমিদারী হালচাল। সে নাক সিঁটকে বলে-' আমি শালা তোর মতো বেজম্মা নই। ঝেতি বল কেনে, এক নাতি মারবো। আমি আমার বাপের গোপাল নস্কর। ঐ থাকবো। ' তাই থাক।

আমি ফাইটটা অতো ভালো দিতে পারি না বলে কথাটা চেপে গেছি। কবরস্তানে ঢোকা আসান কম্ম নয়। বখরা দিতে হয় দারোয়ানকে।তবে ভাঙা পাঁচিল টপকেও ঢুকে পড়ি অনেকদিন। তখন দারোয়ান টেরটি পায় না।

সন্ধের আবছায়াতে আম্মো ঘুরি। তারাও ঘোরে। তাদের আলাদা গন্ধ, অন্য মেজাজ। যারা পুরোনো হতে হতে মোটামুটি ছেঁড়া ক্যালেন্ডার তারা অনেকেই খুব খেঁকুড়ে টাইপ। হবে না? সাত কুলে কেউ নেই, বড় বড় গাছগুলো অবদি এদের হাঁটুর বয়সী। সেই কবে বডি কঙ্কাল থেকে ধুলো হয়েছে, কে তাদের মনে রাখবে!

এদের কবরে শুকনো পাতার ঢিপ, সাপের ঘর।বেচারাদের কিস্যু জোটে না। এক পিস জারবেরা কি দুটি পাতা, কিচ্ছুই না - - কিসমৎ পুরো ঠনঠন গোপাল।এদের কেউ খুব উদাসীন, আবার একএকজন যেন চন্ড। ধরুন কাকটা উড়তে গিয়ে একটু হেগে নোংরা করলো, আমি হয়তো তখনই গোপালকে নিয়ে পাশের কবরে ফুল- মোমবাত্তি কুড়োচ্ছি - - - দিল ধাক্কা মেরে।

আমিও জন, ফুটের ছেলে, তেড়ে বলি' - এটা কি হলো বস!'

-' সাট আপ নেটিভ! কুত্তার বাচ্চা, দেবো ঘাড় মটকে' ' ?এরকম কি সব বলে ভয় দেখায় আর আমি হাসি।

জমিদার গোপালটা কিন্তু ডরকে মারে প্যান্ট ভিজিয়ে নেংটি বনে যায়, বিড়বিড়িয়ে মন্ত্র পড়ে।

আমি বলি-' তোর ভেটকিপুরের মা কালিতে হবে না বে, খিসমাস টি তে মানতের গিঁট বাঁধ।'

-' তুই থাক শালা' - বলে গোপাল পাঁই পাঁই করে পালায়।

আমি নাকের কাছে ডেনড্রাইটের মৌতাত নিই। ঝিমঝিমে অন্ধকার নেমে আসে, রাস্তার তিনবাত্তি জ্বলে উঠলে গোরস্তানের হাওয়া রুকে যায়। নেশা জমতে না জমতেই কয়েকটা বেআক্কেল আমার দিলটা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ধরাম করে বডিটা আছড়ে ফেলল শানে, দেখি পা আটকে গিয়েছে

বুনো লতায়। । আমি বলি-' কেন দিল্লাগি করছো কাকা। তোমরা থাকো, আমিও থাকি।'

স্টিফেন বলে এক ঘাটের মরা আমার ভালো দোস্ত। সত্যিই গঙ্গার ঘাটে হাওয়া খেতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মরেছিল ব্যাটা, তার হনেওয়ালি বিবি জাহাজ চেপে আসছিল কলকাত্তা, সেই আনন্দে একটু বেশি টেনেছিল না কি। যা হোক, এখন তো সে পুরো হাওয়া।রোজ বাতেলা ঝাড়তো তাকে না কি হেব্বি দেখতে ছিল।আমি বলেছি-' দেখাও দিকি কেমন ছিলে?' তোএকদিন অনেক কষ্ট করে শরীর ধারণ করে আমাকে দেখালো। কি বলবো, পুরো খ্যাঁকশেয়ালের মতো দেখতে। ফর্সা খ্যাঁকশেয়াল। আমি তো বহুত হাসলাম। সে রেগেমেগে বলে - একদিন তোর রক্ত খাবো।
আমি হলুদ দাঁত বের করে হাসি-' ফ্যাকফ্যাক। আমার রক্ত কই? সব ডেনড্রাইট।'
সে তখন পাশে বসে বলে -' বিড়ি থাকলে দে দিকি নি। '
স্টিফেন হাওয়ার তৈরি, তায় হাওয়া টানে ভসভস। বলে-' তুই কোনদিন ভয় পেলি না বল। '
আমি বললাম, -' দ্যাখো সাব, কিতাব-উতাব, পুলিশ আর পাগলা কুত্তা ছাড়া কিছুতে ডর নেই। '
সে খেঁকিয়ে বললো-' আর আদমি কে ডরাস না কালা কুত্তা?' স্টিফেন গালি দেওয়া শুরু করলেই মারধোর শুরু করে। আমি কেটে পড়লাম।

আজ ডরোথি ম্যাডামের জনমদিন। তার নাতনি টাটকা গোলাপ রেখে গিয়েছে। সেই মেয়ে হেভি সুন্দর। আমি চোখ ফারকে দেখছি বলে ডরোথি ম্যাডাম কান মুলে দিয়েছে। বলেছে- বাস্টার্ড! আরও ইংরিজি গাল পেড়েছে, অতো বুঝি নি। আমি বললাম-' টাচ করি নি তো!দূর থেকে দেখছি তো খালি ।'
মেমসাহেব অমনি-' খবরদার' বলে একটা ঘূর্ণি তুলে দিয়েছে চোখে বালু ঢুকিয়ে। আঁখ কড়কড় তখন থেকে। যা হোক, সন্ধে নেমে এলো । আমি হলুদ গোলাপ গুলো তুলে নিলাম। গোপাল আসে নি, যেমন ওর আদত, ডরপুকটাকে বাইরে গিয়ে আধা হিস্সা দেবো, আধা নিজের কাছে রাখবো, ভাবলাম।

হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে কেমন শীত শীত হয়েছে শহরটা। আমার গেঞ্জি তে পাঁচটা ফুটো, সেই পাঁচফুটোতে পাঁচ আঙুল ঢুকিয়ে শিরশিরোচ্ছে হাওয়া। আজ সানডের দিন নয়। দৌড়ে দৌড়ে ফুলগুলো বিকতে সময় লাগছে অনেক।

কাঁচের জানলার ওপারে এক কাপ কফি আর গোলাপী কেক খাচ্ছে একটা মেয়ে। এই দোকানটা ফ্লুরি। এর পাশে ওৎ পেতে থাকলে মোটামুটি ফুলগুলো হিল্লে হয়ে যায় জানি। তারপর ফুটো গেঞ্জি দেখে দু পাঁচ রুপেয়া উপরি । তাই এদিকটা চলে এলাম। শালা গোপালটা ভ্যানিশ পুরো।কিন্তু ঐ কফি খাওয়া মেয়েটা কে আমি আজই দেখেছি। ডরোথি ম্যামের নাতনি। আমি ভাবলাম সটকে পড়াই ভালো, ফুল গুলো চিনে নেয় যদি? কিন্তু, ততক্ষণে সে বেরিয়ে এলো, আমিও সরল মুখে বলে দিলাম- ফালয়ার ম্যাম!বিটুফুল রোজেস!
সে অবাক হয়ে ফুল গুলি দ্যাখে, বিশেষ করে নিচের দিকে বাঁধা রিবনটা।কি ভাবে। তারপর বলে-' নো! আই ডোন ওয়ান - - - '
এমন সময় আমার পিছন থেকে কে যেন বলে -' মুঝে দে দো!'
ঘুরে দেখি, উফ!কি দেখতে মাইরি, একটা ছেলে। লম্বা, কোঁকড়া চুল, পুরো রিতিক।
জিনের প্যান্ট, হাঁটুর কাছে শখ করে ছেঁড়া। আমারও আছে একটা ঐরম। সাদা কলার গেঞ্জি, পকেটের কাছে একটা লোক ঘোড়ায় চড়া-
সে বললো- কিৎনা?
আমি জন, বারো পেরিয়ে তেরো, ফুটের ছেলে, বললাম দোসো রূপেয়া।
জানি জানেমনের সামনে রিতিক বেশি কপচাবে না। যা চাইবো দিতেই হবে।

ডরোথি ম্যামের নাতনি কেমন গাল ফুলিয়ে রাস্তার অন্যফুটে দেখছে। বুঝলাম, লম্বু আসতে দের কর দিয়া।
লম্বু তাড়াতাড়ি দুটো একশোর কড়কড়ানি নোট আমার হাতে ধরিয়ে ফুলগুলি নিয়ে বললো- সামান্থা, আই এম রিয়েলি সরি। ইউ নো আই গট স্টাক ইন দ্য জ্যাম, ইউ নো দ্য ব্লাডি ট্রাফিক হেয়ার- -
- আজ তুমি এলে না, আমি একা সিমেট্রিতে
- মিটিং ছিল ডিয়ারি। এই ফুল গ্র্যানির জন্যই, লেটস গো । ওর ফোটোর সামনে সাজাবো চল।
ঐ মেয়েটা বোধহয় ছেলেটাকে সত্যিই দিল দিয়েছে। এটুকুতেই গলে যেন আমুল আইসকিরিম।
বললো- ' চলো। জানো, সেম ইয়েলো রোসেস আমিও গ্র্যানিকে দিয়েছিলাম। সি ওয়াজ ভেরি ফন্ড অফ ইয়েলো রোসেস- , - ' আই নো বেবি'
ওরা হাত ধরাধরি করে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে লাগলো গাড়ির দিকে।

আমি দেখি রাসেল স্ট্রিটের পুরোনো ফার্নিচারের দোকানটার সামনে একটা ভাঙা চেয়ারে ডরোথি ম্যাডাম বসে আছে। আমার দিকে কটকট করে তাকিয়ে আছে, রাগের ঠ্যালায় মেমসাহেবের চোখদুটো যেন দম মারা গুলির আগুন।
' গুস্তাখি মাফ হো মেডাম, ' বলতেই বুড়ি উঠে দাঁড়ালো, যেন কবরখানার পুরোনো বটের গাছ!

আমি ভাই পালালাম।

Barnali Mukherjee is a Masters in Bengali Literature from Jadavpur University, Kolkata. Her specialization is linguistics and her passion poetry. She herself is an avid reader and prolific writer.of Bengali poetry and stories.

অতুলদাদা

- সুশান কোনার

আমার দাদু, অর্থাৎ পিতামহ, ছিলেন বৃটিশ আমলের সরকারী ডাক্তার। বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরতে ঘুরতে তিরিশের দশকে তিনি পৌঁছেছিলেন সাতমাইল এ - খড়গপুর থেকে কাঁথি সংযোগকারী রাজ্য সড়ক ৫ যেখানে উড়িষ্যা কোষ্ট ক্যানাল পার হয়েছে সেই জায়গায়, কাঁথি থেকে ঠিক সাত মাইলের দূরত্বে । নথিপত্র ঘাঁটলে জায়গাটার কৌলিক নাম পাওয়া যাবে নিশ্চয়। কিন্তু, ওই অঞ্চলের রীতি অনুযায়ী কাছাকাছি কোন বড় জায়গার থেকে দূরত্ব মেপেই আশেপাশের পরিচয়। কাজেই..

সেই সময়ে সাতমাইল বেশ জমজমাট গঞ্জ। ক্যানাল এর্ ওপর ব্রীজ তখনো ভবিষ্যতের গর্ভে। কাঁথি তথা দীঘা (আজ্ঞে হ্যাঁ, ২৭ নং জাতীয় সড়ক ধরে মেচেদা হয়ে কলকাতা থেকে আড়াই ঘণ্টায় দীঘা পৌঁছতে তখনও ৪০-৪৫ বছর দেরী আছে, আর তার আগে বেশ কিছু স্রোতস্বিনীর্ সেতু-বন্ধনও হতে হবে) যাত্রীদের্ জন্য সাতমাইলের খেয়াঘাটের গুরুত্ব অপরিসীম। এদিকে ক্যানাল দিয়ে উড়ীষ্যার সঙ্গে ব্যবসা-বানিজ্যের ও তখন দারুণ রমরমা। সাতমাইল হাইস্কুল ওই অঞ্চলে বিখ্যাত, কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ ও পড়াশোনার জন্য বিশিষ্ট। এমনিতেও কাঁথি অঞ্চলের মানুষজনের পড়াশোনা-প্রীতির কথা সর্বজনবিদিত। কাজেই সাতমাইলের সময় শেষে, একটি অজ-পাড়া-গাঁয়ে বদলীর আদেশ পেয়ে ডাক্তার-বাবু চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। ততদিনে এলাকার লোকেদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় জমে উঠেছে। তারাই অভয় দিয়ে ডাক্তার-বাবুকে সাতমাইল বাসী করল।

বাজারের মধ্যে একচালা ঘরে শুরু হল ছোট্টো ডাক্তার-খানা। আর থাকার বন্দোবস্ত হল

সাতমাইল বাজার থেকে সামান্য দূরে উত্তর চড়াইখেয়া গ্রামে। অতুল বিহারি জানা গ্রামের চৌকিদার। সারা গ্রাম টহল দিয়ে বেড়ায় আর ডাক্তার রাতে রুগী দেখতে বেরোলে সঙ্গ দেয়। কেন, কি কারণে সে এই গুরুদায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়েছিল কেউ জানেনা। আর কিভাবেই বা সে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিল সেকথাও কেউ খেয়াল করেনি। নিজের বাড়ি-ঘর বিরাট পরিবার থাকলেও সে বেশির ভাগ সময় কাটাত আমাদের বাড়িতে - ঠাকুমার কাজে সাহায্য করত, ডাক্তার-কে রাত-বিরেতে পাহারা দিত আর তাঁর যত্ন-আত্তি করত। আমার বাবা-কাকা-পিসিদের মানুষ করার কাজও স্বাভবিকভাবেই তার ওপরে অনেকখানি বর্তেছিল। পরের প্রজন্মে আমরাও অনেকে তার শাসন-পালনের আওতায় বড় হয়েছি। আমার ঠাকুমা-কে সে দিদি পাতিয়েছিল। তাই আমার আগের প্রজন্মের কাছে সে অতুলমামা আর আমাদের

অতুলদাদা।

অতুলদাদা পাঠশালার চৌকাঠ মাড়ায় নি। কথা বলত উড়িয়া মেশান বাংলায়। ওই অঞ্চলের লোকে লোকে ইশকুল- কলেজে গিয়ে ভাষাটা শোধন করে কলকাত্তাই বাংলা শিখে নিত - সেটা অতুলদাদার জীবনে হয়নি। তবে সে ছিল অসাধারণ করিতকর্মা মানুষ। কতরকম কাজ যে অবলীলায় করত তার হিসেব নেই। সাতমাইল- বাসের আদিপর্বে একদিন গভীর রাতে দরজায় ধাক্কা - "বাবু অ বাবু.."।ডাক্তার- বাবু ডাকটা কোন সময়ে লোকমুখে ছোট হয়ে শুধু বাবু- তে পরিণত হয়েছিল। (সারা অঞ্চল দাদুকে ' বাবু' নামে জানত। এমনকি আমার বাবা- কাকা- পিসিরাও শুনে শুনে সেই ডাকেই অভ্যস্ত হয়ে গেছিল।) তো গভীর রাতে ' বাবু' র্ ডাক মানেই গুরুতর রোগীর বাড়ির লোক। কম্পাউন্ডার সত্য- কাকু, ডাক্তারের বড়িতেই থাকতেন। তিনি দ্রুত তৈরি হয়ে ডাক্তারি ব্যাগটি গুছিয়ে নিলেন। দাদুর হাতে বিরাট ৮- ব্যাটারি টর্চ, সঙ্গে ব্যাগ হতে সত্য- কাকু আর পেছন পেছন পাহারাদার লাঠি- ধারী অতুলদাদা।

জটিল রোগী, দ্রুত অস্ত্রোপচর না করলে বাঁচার আশা নেই। সেকালে গ্রামের ডাক্তাররা প্রায় কোন পরিকাঠামো ছাড়াই, মাটির বাড়ির বারান্দাতেই জটিল অস্ত্রোপচার করতে বাধ্য হতেন। যেখানে মৃত্যু নিশ্চিত সেখানে অস্ত্রোপচর হলে বাঁচার কিছু

আশা হয় - এই ভরসায় তাঁরা এরকম ভয়ানক ঝুঁকি নিতেন। আজকের দিন হলে কোর্ট- কাছারী, গ্রামের লোকের হাতে ডাক্তারের ঠ্যাঙ্গানি অবধারিত ছিল। কিন্তু সেকালে ডাক্তার ভগবান - ভরসা করে তাঁদের হাতেই রোগীকে ছেড়ে দিতেন বাড়ির লোক। ডাক্তারও হতেন সেইরকম - রুগীর জন্য জান লড়িয়ে দিতেন। কাজেই কোনরকমে অস্ত্রোপচারের বন্দোবস্ত হল। কিন্তু একটা জীবনদায়ী ওষুধের বিশেষ প্রয়োজন, যা দরকার অস্ত্রোপচারের ঠিক পরেই। সে ওষুধ ডাক্তারি ব্যাগে তো ছিলই না , এমনকি সাতমাইল বাজারের ডাক্তারখানাতেও নয়। একমাত্র ভরসা শুধু কাঁথি শহরের স্টকিস্ট। কিন্তু সেখানে যাওয়া যাবে কি করে। অত রাতে বাস বন্ধ হয়ে গেছে, সেই কালে ওই গন্ড- গ্রামে ট্যাক্সি তো আকাশকুসুম ক ল্পনা। অগত্যা অতুল- দাদা এগিয়ে এসে বলল সে যাবে কাঁথি, রণপা করে। (আশ্চর্য মানুষ অতুলদাদা রণপা চড়ে ঝড়ের বেগে দৌড়োতে পারত। আমাদের ছোটোবেলায়, যখন তার বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই তখনো দেখেছি সেই আশ্চর্য দৌড়।) "বাবু আপুনি আমাকে ওষুধ লিখি দে, সে আমি ঝটকি যাইকিরি লিয়ে আসব আর কি।" (আপামর জনসাধারনকে অতুলদাদা ' তুই' বলে সম্বোধন করত। শুধু দাদুর বেলায় একটা ' আপনি' লাগাত।) দাদু লিখে দিলেন। অতুলদাদা বাড়ি থেকে তার রণপা দুটি সংগ্রহ করে মাঠ- ঘাট পেরিয়ে, জল- জঙ্গল ভেদ করে কাঁথি ছুটল।

দাদুর ডাক্তারখানার জন্য ওষুধ আনতে স্টকিস্ট এর গোডাউনে অতুলদাদা অনেকবার গেছে, সে যায়গা খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় নি। কিন্তু মাঝরাতে সেখানে একাটি দারোয়ান ছাড়া কেউ নেই। তাকেই বগলদাবা করে অতুলদাদা চড়াও হল সেই স্টকিস্ট এর বাড়ি। ডাক্তার কোনার এর ওষুধ দরকার শুনে মাঝরাতে গোডাউন খুলে ওষুধ বার করে দিয়েছিলেন স্টকিস্ট মহাশয়, যা আজকের দিনে আমরা কল্পনাও করতে পারবো না। সেই ওষুধ নিয়ে যখন অতুলদাদা চড়াইখেয়া

ফেরে তখন দাদু আর সত্য-কাকু এদিকের কাজ শেষ করে এনেছেন। সে রুগী সেযাত্রা বেঁচে উঠেছিলেন বলেই শুনেছি। তবে আমি নিশ্চিত সেদিন অতুলদাদার রণপা দৌড় না হলে দাদুর চিকিৎসা বিফলে যেত।

অতুলদাদা গুণীও ছিল খুব। অসাধারণ বাঁশি বাজাতো সে। আমার সেজো-কাকা আর ছোট-পিসি তার কাছে শিখেছিল বাঁশি। আর আমাকে সে পড়িয়েছিল জটিল পাটিগণিতের প্রথম পাঠ। কেশব নাগ বা যাদব চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় হবার অনেক কাল আগে। ক্ষুরধার বুদ্ধি ছিল তার। একটু-আধটু অঙ্ক পারতাম বলেই বোধহয় তার কাছে আমার কদর ছিল কিঞ্চিৎ বেশী। কাছে-দূরে কোথাও মেলা কি হাট বসলেই অতুলদাদা আমাকে কাঁধে বসিয়ে ঘুরতে নিয়ে যেতো। অতুলদাদার কাঁধে বসে পৃথিবী দেখতে দেখতে চলা মনে যে নির্ভেজাল আনন্দ তা কিন্তু নয়। এই সময়েই তার ঝুলি থেকে বেরোতো অতি জটিল সব অঙ্কের ধাঁধা, যার উত্তর আমাকে তখনি মুখে মুখেই দিতে হত। না পারলেই সন্ধ্যে বেলায় দাদুর পায়ে তেল মালিশ করতে করতে আক্ষেপ - "বাবু বুঝিলি, এ বায়ানির অঙ্কে মথাটি নাহি, এ আপুনির পরা ডগডর কি বড়োমামার (অর্থাৎ আমার পিতৃদেব) পরা ইঞ্জিনর কিছুটি হব নি।" আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, পাঠশালার চৌকাঠ না মাড়ানো এক গ্রামীণ মানুষ কিন্তু ' বায়ানি' র (উড়িয়া ভাষায় যার অর্থ ছোটো মেয়ে) জন্য চিরাচরিত স্বামী-সন্তান-সংসার এর কথা না ভেবে বাপ-ঠাকুরদার মত উচ্চ মেধার পেশায় নিযুক্তিই স্বাভাবিক বলে মনে করেছিল। আমাদের পরিবারে তখনো পর্যন্ত সেরকম কোন নারী তো দূরস্থান সেভাবে কোন মহিলা চাকুরিজীবিও ছিলেন না। হয়তো অতুলদাদার মতো মানুষজনের গভীর বিশ্বাসের শক্তিতেই আমাদের প্রজন্ম ' মেয়ে' হবার দুর্ভোগগুলি হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে এসে পৌঁছতে পেরেছে আধুনিক লিঙ্গ সাম্য অর্থাৎ gender equityর যুগে।

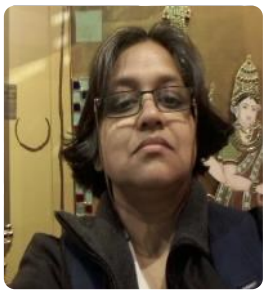

সুশান কোনার একজন তাত্বিক জ্যোতিঃপদার্থবিদ (theoretical astrophysicist), স্থান-কাল-পাত্র নির্বিচারে জ্ঞান দেওয়া যার বিবিধ বদভ্যাসের একটি। অন্যথায় ইনি সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ে লেখেন, একটি অনিয়মিত ব্লগে নিজস্ব জীবনচর্যার কথা বলেন আর সুযোগ পেলেই লিঙ্গ-সাম্যের বিষয় নিয়ে চেঁচামেচি করেন।

সম্পাদক

পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদ পূজা কমিটি